আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান

মূল :

মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু
শিক্ষক, দারুল হাদীস, মক্কা মুকাররামা

অনুবাদ :

মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

أركان الإسلام والإيمان بنغالي

مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة
هاتف : ٤٢٩١٩٤٢ ناسوخ : ٤٢٩١٨٥١ ص.ب : ١٥٤٤٨٨ الرياض : ١١٧٣٦
حساب رقم : ٤/٩٣٤٠٠ شركة الراجحي المصرفية فرع سلطانة .

আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান

أركان الإسلام والإيمان

আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান

মূল :

মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনূ

শিক্ষক, দারুল হাদীস, মক্কা মুকাররমা

অনুবাদ :

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

বি. এস. সি. বি. ই. (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা);

উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকাররমা হতে

আরবী ভাষা, দা'ওয়া ও আক্বীদা বিষয়ে সনদ প্রাপ্ত

م . ب . د

প্রকাশক :

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
১৯৭, শান্তিবাগ
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : শা'বান, ১৪১৩ হিঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ঈসায়ী

((বিনামূল্যে বিতরণের জন্য))
[FREE DISTRIBUTION – NOT FOR SALE]

প্রচ্ছদ : এস, রায়

কম্পিউটার টাইপসেট ও মুদ্রণ :

আল-মাইমানা কম্পিউটার গ্রাফিক্স (আমকোগ্রাফিক্স)
১৫এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচী পত্র

আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান

বিষয় পৃষ্ঠা

আল-আক্বীদাহ্‌ আল-ইসলামিয়াহ্‌

বিষয়		পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও ঈমানের অর্থ। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর তাৎপর্য।

ইসলামের ভিত্তি সমূহ

রাসূল ﷺ বলেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:

১। কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয়া।

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের অর্থে কোন উপাস্য নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ এর ঐ সমস্ত কথা ও কাজের উপর 'আমল করা ওয়াজিব যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছিয়েছেন।

২। সালাত কায়েম করা: এর মধ্যে আছে উহার রোকন ও ওয়াজিব সমূহ পুরাপুরি আদায় করা এবং সালাতের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভয়) বজায় রাখা।

৩। যাকাত প্রদান করা: যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম পরিমাণ সোনা বা ঐ পরিমাণ অর্থের মালিক হয় তখন তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। প্রত্যেক বৎসরের শেষে সে যাকাত হিসাবে শতকরা ২$\frac{১}{২}$ (আড়াই) ভাগ আদায় করবে।

নগদ টাকা ব্যতিত অন্যান্য জিনিসের যাকাত আদায়ের নির্দিষ্ট হিসাব আছে।

৪। বাইতুল্লাহতে হজ্জ আদায় করা: যার সামর্থ আছে উহা তার উপরে ফরজ।

৫। রমজানে সিয়াম পালন করা: উহা হল খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য যে সব কারণে সিয়াম (রোজা) ভঙ্গ হয় উহা হতে সিয়ামের (রোজার) নিয়তে ফজর হতে মাগরিব পর্যন্ত বিরত থাকা।

উপরোক্ত হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের মিলিত হাদীছ।

ঈমানের ভিত্তি সমূহ

১। আল্লাহপাকের উপর ঈমান আনা: এতে অন্তর্ভূক্ত আছে তাঁর অস্তিত্বে ও একত্ববাদে বিশ্বাস করা- ছিফত সমূহে এবং ইবাদতের মধ্যেও।

২। তাঁর ফেরেশ্‌তাদের (মালাইকাদের) উপর ঈমান আনা : তারা হচ্ছেন নূরের তৈরী। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌পাকের হুকুম সমূহকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য।

৩। তাঁর কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনা : উহাদের মধ্যে আছে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, কুরআন। তন্মধ্যে কুরআনপাক সর্বোত্তম।

৪। তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনা : তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ।

৫। আখিরাতের উপর ঈমান আনা : উহা হচ্ছে হিসাব নিকাশের দিন, যেদিন মানুষের 'আমলসমূহের বিচার হবে।

৬। আর কদর বা ভাগ্যের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা : তার মধ্যে আছে আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করা, আর ভাগ্যের ভাল, মন্দ যাই ঘটুক না কেন তাতে রাজী থাকা, কারণ উহা আল্লাহ্ হতে প্রদত্ত। (এই মূল হাদীছটি মুসলিমে আছে)

ইসলাম, ঈমান ও এহসানের অর্থ

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূল ﷺ এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁর পোশাক ছিল ধবধবে সাদা আর চুল ছিল কুচকুচে কালো। দূর হতে ভ্রমণ করে আসার কোন লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না, অথচ তিনি আমাদের পরিচিতও ছিলেন না। তিনি রাসূল ﷺ এর নিকটবর্তী হলেন, তাঁর হাঁটুতে হাঁটু লাগালেন এবং তাঁর দুই হাতের তালু নিজের উরুর উপর রেখে বসলেন। তারপর বললেন : হে মুহাম্মদ ﷺ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জানান। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানে সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহ্‌র ঘরে যেয়ে হজ্জ করা। উত্তর শুনে তিনি বললেন : সত্য বলেছেন। আমরা অবাক হয়ে গেলাম– প্রশ্নও তিনি করছেন, আবার তিনিই উত্তরকে সত্য বলে মানছেন।

তিনি আবার বললেন : এখন আমাকে ঈমান সম্বন্ধে বলুন। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : উহা হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের উপর, তাঁর ফেরেশ্‌তাদের (মালাইকাদের) উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর এবং আখিরাতের উপর এবং কদরের ভাল মন্দের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। উত্তর শুনে উনি বললেন : সত্য বলেছেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন : এখন আমাকে এহসান সম্বন্ধে বলুন। উত্তরে রাসূল বললেন : এমনভাবে আল্লাহ্‌পাকের ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তাঁকে নাও দেখ, তিনিতো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। তারপর তিনি বললেন :

আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : প্রশ্নকারী হতে জবাব দানকারী এ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত নয়। তারপর তিনি বললেন : তবে আমাকে তার আলামত বা নিদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি বললেন : দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। আর দেখবে নগ্নপদ, পোশাকহীন, ক্ষুধার্ত রাখালেরা উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করবে। এরপর আগন্তুক চলে গেলেন। তারপর রাসূল ﷺ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর আমাকে প্রশ্ন করলেন : হে ওমর ! তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে ? উত্তরে বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন : ইনি ছিলেন জিবরাইল (আঃ)। তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (সহীহ মুসলিম)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ

আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। এই কালেমাতে গাইরুল্লাহ যে মা'বুদ তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহই যে সত্যিকারের মা'বুদ তা স্বীকার করে।

১। আল্লাহপাক বলেন :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

অর্থাৎ *(জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই)* (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত - ১৯)।

২। রাসূল ﷺ বলেন :

مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে)*। (সহীহ্, বাজ্জার)।

মোখলেছ কে ?

যিনি কালেমার অর্থ বুঝেন, তার উপর আমল করেন এবং সর্বপ্রথমে কালেমার দাওয়াত দেন তিনিই মুখলেছ। কারণ, এর ভিতরে ঐ তাওহীদ রয়েছে যার নিমিত্ত আল্লাহপাক জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন।

৩। রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আবু তালিবের যখন মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হয় তখন তাকে দাওয়াত দিয়ে বলেন : *(হে আমার চাচা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, উহা বললে আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য আবেদন করতে পারব। কিন্তু তিনি কালেমা বলতে অস্বীকার করলেন)*। (বুখারী ও মুসলিম)

৪। রাসূল মক্কাতে ১৩ বৎসর যাবত মুশরিকদের এই দাওয়াত দিয়েছেন যে, তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। তারা উত্তরে যা বলত সে সম্বন্ধে কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন :

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ . وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ، مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ، إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ . (سورة ص، ٤-٧)

অর্থাৎ *((এবং যখন তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে ভয় প্রদর্শক আসলেন তখন তারা অবাক হয়ে গেল এবং কাফিররা বলল : ইনি তো যাদুকর ও মিথ্যাবাদী। সে কি আমাদের সমস্ত মা'বুদকে এক মা'বুদ বানাতে চায় ? ইহাতো বড়ই অবাক হওয়ার কথা। তখন তাদের নেতারা তাদেরকে ঘুরে ঘুরে বুঝাল : তোমরা তোমাদের মা'বুদ নিয়েই চলতে থাক, তাতে যত ছবরই করতে হোক না কেন। এটাই চাওয়া হচ্ছে। আমরা তো আগের জামানার লোকদের নিকট এটা কখনও শুনিনি। বরঞ্চ এটা বানানো কথা))* [সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৪-৭]। কারণ আরবরা কালেমার অর্থ বুঝেছিল। যে ব্যক্তি উহা মুখে উচ্চারণ করবে কিংবা স্বীকার করবে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করতে পারবে না। ফলে তাদের বেশীর ভাগই কালেমা পড়তে অস্বীকৃতি জানাল।[১] আল্লাহপাক তাদের সম্বন্ধে বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ . بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ ، وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ . (صفت : ٣٥-٣٧)

অর্থাৎ *((যখন তাদের বলা হত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখনই তারা অহংকারে মুখ ঘুরিয়ে বলত : আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদদের পরিত্যাগ করব ? কিন্তু তিনি সত্য নিয়ে এসেছিলেন এবং পূর্বের নবীদেরও সত্য বলে মেনে ছিলেন))*। সূরা ছফফাত, আয়াত ৩৫-৩৭।

রাসূল বলেন :

مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . (مسلم)

---

[১] কালেমার অর্থ কি ? কেন কালেমার এত উচ্চ মর্যাদা ও প্রাধান্য, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর বান্দার জান্নাত লাভে কালেমার কি ভূমিকা ইত্যাদি জানতে হলে লেখকের অনুবাদকৃত "তাওহিদ বা আল্লাহ্পাকের একত্ববাদ" গ্রন্থ পড়ুন।

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করাকে অস্বীকার করে তার সম্পদ, রক্ত অন্যের জন্য হারাম আর তার হিসাব নিপতিত হয় আল্লাহ পাকের উপর)।* (মুসলিম)

এই হাদীছের অর্থ : যখনই কেউ কালেমা পড়বে তখনই তার উপর জরুরী হয়ে যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করা। যেমন মৃতদের নিকট দু'আ করা বা এই জাতীয় অন্যান্য ইবাদত। সত্যিই অবাক লাগে, কোন কোন মুসলিম এই কলেমা পড়ে, কিন্তু তাদের কাজে কর্মে এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমনকি আল্লাহকে ছেড়ে গাইরুল্লাহ্‌র নিকট দু'আও করে।

৫। কালেমা لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও ইসলামের ভিত্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়, যাতে আছে সমস্ত ধরণের ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হবে। কারণ, যখন কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে অবনত করবে, একমাত্র তাঁর নিকটেই দু'আ করবে এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করবে তখনই তার জীবন পূর্ণভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত হবে।

৬। ইবনে রজব (রঃ) বলেন : ইলাহ হচ্ছেন ঐ জাত যার আনুগত্য করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না তাঁর প্রতি ভয়ে ও সম্ভ্রমে। তাঁর প্রতি থাকবে ভালবাসা, ভয় ও আশা। তাঁর উপর ভরসা করে তাঁর নিকট অনুকম্পা চাওয়া হয় দু'আ করে। এগুলো দেবার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের। একমাত্র মা'বুদের জন্যই প্রযোজ্য উপরোক্ত ইবাদত সমূহ। কোন সৃষ্টিকে শরীক করলে কালেমার মধ্যে যে ইখলাছ থাকার কথা তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা মাখলুকের ইবাদত হিসাবে শামিল হয়।

৭। রাসূল ﷺ বলেছেন :

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَا أَصَابَهُ. (رواه ابن حبان)

অর্থাৎ *(মৃত্যুর সময় তোমরা মৃতপথ যাত্রীদের কালেমার তালকীন (বারে বারে পড়া) দাও। কারণ, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে* لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ *(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সে, একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেই, এর পূর্বে তার যত শাস্তিই হোক না কেন)।* ইবনে হিব্বান, সহীহ।

তালকীন শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় কালেমা পড়ার নাম নয়, বরঞ্চ অন্যেরা যদি কোন বদ ধারণা করে তার বিরুদ্ধাচরণ করাও এতে সামীল। এর দলীল হচ্ছে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর হাদীছঃ

রাসূল ﷺ কোন এক আনসারী ছাহাবীর রোগ দেখতে যান। তাঁকে বললেনঃ হে মামা! বলঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেনঃ মামা না, চাচা: উত্তরে রাসূল ﷺ বললেনঃ বরঞ্চ মামা। তিনি বললেনঃ তবেতো আমার জন্য উত্তম হচ্ছে কালেমা পড়া। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেনঃ হাঁ, অবশ্যই। মসনদে আহমদ, সহীহ।

৮। কালেমা - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তার পাঠককে উপকার দেয় যদি সে উহা তার জীবনে প্রতিফলিত করে। আর কোন শিরকী কাজ না করে, যা কালেমার বিরুদ্ধাচরণ। যেমনঃ মৃত কোন ব্যক্তি অথবা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট দু'আ করা। উহা হচ্ছে অযুর ন্যায়, যা অযু ভঙ্গের যে কোন কারণ ঘটলে নষ্ট হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে উহা তাকে একদিন না একদিন সমস্ত ধরণের শাস্তি (জাহান্নামের) হতে উদ্ধার করবে। বায়হাকী, সহীহ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অর্থ

এই ঈমান পোষণ করা যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, অতএব তাঁর সমস্ত কথাকে সত্য বলে স্বীকার করা আর তিনি যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা। যে কথা বা কাজ করতে নিষেধ করেছেন বা ধমকি দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর আমরা আল্লাহ্ পাকের ইবাদত সে ভাবেই করব যেভাবে তিনি করতে বলেছেন।

১। শায়খ আবুল হাসান আন-নদভী তার "নবুয়ত" গ্রন্থে বলেনঃ প্রত্যেক যামানায় ও এলাকায় সমস্ত নবী (আলাই হিমুস্‌সালাম) দের প্রথম দাওয়াত আর সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে আকীদা সহীহ্ করা। সাথে সাথে বান্দা ও তার রবের মধ্যের সম্পর্ক সহীহ্ করা। আর ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দেয়া, এক আল্লাহ্র ইবাদত করা। কারণ, ভাল ও মন্দ করার অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতএব, ইবাদত পাওয়ার হক্দার তিনিই। দু'আ, বিপদে আশ্রয়, যবেহ্ করা সবই তারই জন্য হতে হবে। প্রত্যেকেই তাদের যামানায় যে ধরণের পৌত্তলিকতা ও শিরক প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিতেন। এর মধ্যে থাকত কোন মূর্তি, গাছ্ বা পাথরের পূজা। আর তাদের যামানার উত্তম ও নেককার লোক, চাই সে মৃতই হোক বা জীবন্ত, তাদের ইবাদত করা হতে বিরত রাখতেন।

২। আমাদের রাসূল ﷺ কে পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন :

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . (اعراف، ١٨٨)

অর্থাৎ *((হে নবী ﷺ ! আপনি বলুন, আমি আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতার অধিকারী পর্যন্ত নই। একমাত্র আল্লাহপাক যা চান তাই হবে। যদি আমি গায়েবের ইল্‌ম্ জানতাম, তাহলে বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম, আর খারাবী কখনও আমাকে স্পর্শ করতো না। বরঞ্চ আমিত, ঐ কওম যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা))*। সূরা 'আ'রাফ, আয়াত ১৮৮।

রাসূল ﷺ বলেন :

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ - (بخاری)

অর্থাৎ *(তোমরা আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে ঐ রকম সীমা অতিক্রম কর না, যেমন নাছারারা (খৃষ্টান) ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর ক্ষেত্রে করেছে। আমিত আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই বলবে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল)*। বুখারী।

"এতরা" হচ্ছে প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। আমরা কখনই আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের নিকট দু'আ করব না, যেমন নাছারারা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর ক্ষেত্রে করেছে। ফলে তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়েছে।

তাই তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, তাকে আবদুল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলতে।

৩। রাসূল ﷺ কে মহব্বত-এর মধ্যে শামিল হচ্ছে এক আল্লাহ্‌র নিকট দু'আর ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা এবং কোন অবস্থাতেই অন্যের নিকট দু'আ না করা, যদিও সে ব্যক্তি কোন নবী, রাসূল বা অলীই হোন না কেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেন :

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ - (رواه الترمذی وقال حسن صحیح)

অর্থাৎ *(যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই চাও, আর যখন বিপদে সাহায্য চাও তখনও একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও)*। তিরমিযি, হাসান সহীহ।

যখন নবী ﷺ এর উপর কোন দুঃখ পেরেশানী অবতীর্ণ হত তখন তিনি বলতেন :

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ . (حسن رواه الترمذی)

অর্থাৎ *(হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী, তোমার দয়ার অছিলায় সাহায্য চাচ্ছি)*। হাসান, তিরমিযি।

তাই কবি যথার্থই বলেছেন :

যদি তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা সত্য হত তবে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে। কারণ, মহব্বতকারী যাকে মহব্বত করে তাকে মান্যও করে। রাসূল ﷺ এর সাথে সত্যিকারের মহব্বতের মধ্যে এও আছে যে, সে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়াকে ভালবাসবে, কারণ তিনি সর্বপ্রথম উহার প্রতিই দাওয়াত দেন। আর যারা তাওহীদের দিকে মানুষদের ডাকে তাদেরও ভালবাসবে। সাথে সাথে শির্ক এবং উহার দিকে যারা ডাকে তাদের অপছন্দ করবে।

আল্লাহ্পাক কোথায়? তিনি আসমানে

মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আসসুলামী (রাঃ) বলেন : আমার একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে আমার বকরীসমূহ অহুদ ও জোয়ানিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী এলাকায় চড়াত। একদিন সে এসে বলল যে, একটা নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। যেহেতু আমি একজন মানুষ এবং যে যে কারণে মানুষ রাগান্বিত হয় আমিও তা থেকে মুক্ত নই, তাই রাগে তাকে একটা চড় দিয়ে বসি। তারপর রাসূল ﷺ এর নিকটে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ঐ ঘটনা আমাকে খুবই কষ্ট দিচ্ছিল। আমি বললাম : (হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমি কি তাকে মুক্ত করে দিব ? তিনি বললেন : তাকে আমার নিকট উপস্থিত কর ? তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলত আল্লাহ্ কোথায় ? সে উত্তরে বলল : আসমানে। তারপর তিনি বললেন : বলত আমি কে ? সে বলল : আপনি আল্লাহ্পাকের রাসূল। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, সে মোমেনা)) মুসলিম, আবু দাউদ।

হাদীছটির ফায়দা

১। ছাহাবী কেরাম (রাঃ) গণ তাদের যে কোন অসুবিধাতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, রাসূল ﷺ এর সন্নিকটে উপস্থিত হতেন, ঐ ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের কি হুকুম তা জানার জন্য।

২। দ্বীনের যে কোন ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মত বিচার করার ব্যাপারে আল্লাহ্পাক বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. (النساء: ٦٥)

অর্থাৎ *((না, কক্ষনই না, আপনার রবের কসম। তারা কক্ষনই ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে মতভেদ ঘটেছে তার বিচারের ভার আপনার উপর*

না দেয়, তারপর আপনি যে বিচার করে দেন তাতে কোন মনঃকষ্ট না পায়ঃ বরং তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নেয়)))। সূরা নিসা, আয়াত ৬৫।

৩। ছাহাবী (রাঃ) যিনি তার দাসীকে মেরেছিলেন, রাসূল (ﷺ) তার আচরণকে অন্যায় রূপে বর্ণিত করে তার দাসীকেই বড় করে দেখেন।

৪। কখনও ক্রীতদাস মুক্ত করতে হলে শুধুমাত্র মোমেনদের মুক্ত করতে হবে, কাফেরদের নয়। কারণ, রাসূল (ﷺ) তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। যখন বুঝলেন যে, তিনি মোমেনা তখন তাকে মুক্ত করতে বললেন। যদি সে কাফেরা হত তবে তাকে মুক্ত করতে হুকুম দিতেন না।

৫। আল্লাহপাকের একত্ববাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ওয়াজেব। তার মধ্যে আছে, আল্লাহপাক যে আরশের উপর আছেন তাও। আর এ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া ওয়াজেব।

৬। আল্লাহ কোথায় ? এই প্রশ্ন করা শরীয়ত সম্মত ও সুন্নত। কারণ রাসূল (ﷺ) উহা করেছিলেন।

৭। আল্লাহ যে আসমানের উপর আছেন এ জবাব দেওয়াও শরীয়ত সম্মত। কারণ, এই উত্তরকে রাসূল (ﷺ) স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর কুরআনপাকও এর সমর্থনে বলেঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ . (الملك : ١٦)

অর্থাৎ *((তোমরা কি তাঁর ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছো যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন না)))।* সূরা মুল্‌ক, আয়াত ১৬।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। আর আসমানে আছেন -এর অর্থ উহার উপরে আছেন।

৮। ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে সাথে রাসূল (ﷺ) যে আল্লাহর রাসূল তার সাক্ষ্য দেয়া হবে।

৯। আল্লাহপাক যে আসমানের উপর, এই সাক্ষ্য দেয়াটা ঈমানের সততার প্রমাণ দেয়। আর এই সাক্ষ্য দেয়া প্রত্যেক মোমেনের জন্য ওয়াজিব।

১০। যারা বলে যে, আল্লাহ্‌পাক সশরীরে সর্বত্র বিরাজমান তাকে খণ্ডণ করছে এই হাদীছ। সত্য হল, আল্লাহপাক তাঁর ইল্‌মের দ্বারা সর্বত্র ও সর্ব সময়ে আমাদের সাথে আছেন।

১১। রাসূল ﷺ ঐ ক্রীতদাসীকে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাসী ঈমানদার ছিল কিনা এটা তিনি জানতেন না এবং উহা দ্বারা ঐ সমস্ত সুফীদের কথাকে খণ্ডন করছে যারা বলে যে, তিনি গায়েব জানতেন।

সালাতের ফজিলত ও উহা তরককারীর পরিণাম

১। আল্লাহপাক বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ . (المعارج: ٣٤-٣٥)

অর্থাৎ *((এবং যারা তাদের সালাত সমূহকে হেফাজত করে তারাতো জান্নাতে সম্মানের আসন পাবে))*। সূরা মায়ারিজ, আয়াত ৩৪-৩৫।

২। আল্লাহপাক আরও বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . (العنكبوت: ٤٥)

অর্থাৎ *((এবং সালাতকে কায়েম কর, নিশ্চয়ই সালাত সমস্ত ধরণের মন্দ ও গর্হিত কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে))*। সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫।

৩। আল্লাহপাক আরো বলেন : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

অর্থাৎ *((ঐ সমস্ত সালাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী))*। সূরা মাউন, আয়াত ৪-৫।

অর্থাৎ উহা হতে গাফেল এবং নির্দিষ্ট সময়ে উহা আদায় করে না, অথবা ওযর ব্যতীতই দেরী করে আদায় করে।

৪। আল্লাহপাক বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . (المؤمنون: ١)

অর্থাৎ *((নিশ্চয়ই ঐ মোমেনগণ কামিয়াব হবে যারা তাদের সালাতের মধ্যে খুশু (আল্লাহ্র ভয়) এখতিয়ার করে))*। সূরা মোমেনুন, আয়াত ১।

৫। আল্লাহপাক আরও বলেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا .
(مريم: ٥٩)

অর্থাৎ *((তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ আসলো যারা সালাত সমূহকে নষ্ট করল এবং নিজেদের খেয়াল খুশীমত (শাহ্ওয়াত অনুযায়ী) চলতে শুরু করল, শ্রীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।))* সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯ ।

৬। রাসূল ﷺ বলেন :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. (متفق عليه)

অর্থাৎ *(বলতো যদি কারো বাড়ীর দরজার নিকট কোন নহর (নদী) প্রবাহিত হতে থাকে, আর তাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন নাপাকি থাকবে ? ছাহাবী কেরাম (রাঃ) গণ বললেন : না, কক্ষনই কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। উত্তরে তিনি বললেন : এই রকমই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ যার দ্বারা আল্লাহপাক বান্দার গুনাহসমূহকে দূরীভূত করেন) ।* বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ।

৭। রাসূল ﷺ আরো বলেন :

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (صحيح رواه احمد وغيره)

অর্থাৎ *(তাদের (কাফেরদের) সাথে আমাদের পার্থক্য হল সালাত । যে তাকে পরিত্যাগ করল সে যেন কাফের হয়ে গেল) ।* সহীহ, আহ্মদ ।

৮। রাসূল ﷺ বলেন :

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . (رواه مسلم)

অর্থাৎ *(কোন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরির মধ্যে পার্থক্য হল সালাতকে পরিত্যাগ করা) ।* মুসলিম ।

ওযূ ও সালাত শিক্ষা

ওযূ : বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে দুই জামার হাতা কুনুই পর্যন্ত গুটান, এরপর —

১। তিনবার করে দুই হাতের কব্জী পর্যন্ত ধৌত করুন প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত। তারপর তিনবার করে কুলি করুন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া দিন।

২। তারপর তিন বার করে মুখমণ্ডল ধৌত করুন ।

৩। তিনবার করে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করুন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত।

৪। তারপর সম্পূর্ণ মাথাকে কানদ্বয় সহকারে মাছেহ করুন।

৫। তারপর ৩ বার করে দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করুন। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা।

ফজরের সালাত

সকালের (ফজরের) সালাতে ফরজ হচ্ছে দুই রাকা'আত। নিয়ত করতে হবে মনে মনে।

১। প্রথমে ক্বিবলার দিকে মুখ করতে হবে। তারপর হস্তদ্বয়কে কান পর্যন্ত উঠায়ে বলতে হবে "আল্লাহু আকবার"।

২। তারপর বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর স্থাপন করতে হবে।

তারপর পড়ুন —

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ .

"সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়াতা আলা জাদ্দুকা, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।" অর্থাৎ (হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি প্রশংসার সাথে সাথে। আপনার নাম অত্যন্ত বরকতময়, আপনার সম্মান অতি উচ্চ এবং আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই)। ইহা ছাড়া সহীহ সুন্নতে আরো যে যে দু'আ আছে তার কোনটাও পড়া যায়।

তারপর প্রথম রাকা'আতে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আউজুবিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানের রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম মনে মনে পড়তে হবে।

তারপর সূরা ফাতেহা:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ
آمين

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল 'আলামিন। আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়া কানা'বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তা'ইন। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাত্বল মুসতাক্বীম, ছিরাত্বল্লাযিনা আন্'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগ্‌দুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লীন। আমীন।

তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলে যে কোন একটা ছুরা পড়তে হবে।

১। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঁচু করে রুকুতে যেতে হবে এবং হাতের তালু দিয়ে দুই হাটু শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। তারপর বলতে হবে — سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ *"সুবহানা রাব্বিয়াল 'আজীম"* অর্থাৎ (আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) কমপক্ষে ৩ বার।

২। তারপর সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে বলতে হবে — سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . *"সামী'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ))।* অর্থাৎ (যে কেউ আল্লাহপাকের প্রশংসা করে তিনি তা শুনতে পান। হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই প্রাপ্য)।

৩। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদাতে যেতে হবে। সিজদাতে দুই হাতের পাতা, হাটুদ্বয়, কপাল, নাক ও দুপায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী হয়ে মাটিতে থাকবে, তবে কনুই দ্বয় মাটি স্পর্শ করবে না। তারপর বলুন — سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ *"সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা"* ৩ বার অর্থাৎ (আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।

৪। তারপর আল্লাহু আকবার বলে প্রথম সিজদা হতে মাথা তুলুন এবং হাতের তালু হাটুর উপর রাখুন। তারপর বলুন— رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ *"রাব্বীগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আফীনী ওয়ারযুক্‌নী"* অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া বর্ষণ করুন, আমাকে হেদায়েত দান করুন, আমাকে দোষ মুক্ত করুণ এবং উত্তম রিযিক দান করুন।

৫। তারপর একইভাবে দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং বলুন — سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ *"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা"* তিনবার।

৬। তারপর দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে পড়ুন আল্লাহু আকবার বলে।

দ্বিতীয় রাকা'আত

১। তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ুন। তার সাথে যে কোন সূরা মিলান অথবা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করুন।

২। তারপর প্রথম রাক'আতের অনুরূপ রুকু সিজদা করুন। দ্বিতীয় সিজদার পরে আত্তাহিয়াতু পড়তে বসুন। ডান হাতের আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করুন এবং অনামিকাকে উঠিয়ে নাড়তে থাকুন এবং পড়ুন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه،
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه
وَرَسُوْلُهٗ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ۔ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

অর্থাৎ (সমস্ত শুভ সম্ভাষণ একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য। সমস্ত সালাত ও উত্তম জিনিসও তাঁরই। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহপাকের সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও আল্লাহপাকের শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের উপর সালাত বর্ষণ করুন যেমন ভাবে ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর সালাত (ক্ষমা) বর্ষণ করেছিলেন। আর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের উপর আপনার বরকত দান করুণ যেমন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম প্রশংসিত ও উন্নত।

তারপর বলুন —

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ۔ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কবরি, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত; ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসিহুদ্ দাজ্জাল।)

অর্থাৎ *(হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট বাঁচতে চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব হতে এবং দুনিয়ার জীবনের ফিৎনা, মৃত্যুর পরের ফিৎনা ও মসিহ দজ্জালের ফিৎনা হতে।)*[১]

---

[১] রুকু, সিজদাহ্, তাশাহুদ সহ দৈনিক নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত দু'আ নবী (ছঃ) পাঠ করেছেন বলে সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে সে সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে হলে অনুবাদকের আর একখানি বই "আয্‌কার" পাঠ করুন।

৩। তারপর ডান পাশে মুখ ঘুরিয়ে বলুন "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" একইভাবে বাম পার্শ্বেও মুখ ঘুরিয়ে সালাম করুন।

সালাতের রাকা'আত সমূহের চার্ট

সালাত	ফরজের পূর্বে সুন্নত	ফরজ	ফরজের পরের সুন্নত
ফজর	২ রাকা'আত	২	X
জোহর	২ + ২	৪	২
আছর	২ + ২	৪	X
মাগরিব	২	৩	২
এশা	২	৪	২ +৩ রাকা'আত বিত্র
·জুমআ	২ রাকা'আত তাহ্ইয়াতুল মসজিদ	২	২ +২ রাকা'আত মসজিদে অথবা ২ রাকা'আত ঘরে ফিরে

সালাতের কিছু আহ্কাম

১। পূর্বের সুন্নত ঃ ইহা ফরজের পূর্বে আদায় করতে হয়। আর ফরজের পরের সুন্নত ফরজের পরে আদায় করতে হয়।

২। সালাতে দাঁড়াতে হবে ধীর স্থীর ভাবে। সিজদার জায়গাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এদিকে ওদিকে তাকান নিষেধ।

৩। যখন ইমাম সাহেবের ক্বিরাত শুনা যায় তখন খুব খেয়ালের সাথে তা শুনতে হবে। আর যদি তা শুনা না যায়, তবে নিজে মনে মনে ক্বিরাত পড়তে হবে।

৪। জুম'আ এর ফরজ ২ রাকা'আত। আর উহা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র পড়া যাবেনা। মসজিদে খুতবার পর তা পড়তে হবে।

৫। মাগরিবের ফরজ ৩ রাকা'আত। প্রথম ২ রাকা'আত ফজরের ২ রাকা'আতের মতই পড়তে হবে। ২ রাকা'আত শেষে আত্তাহিয়াতু পড়ে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াতে হবে তৃতীয় রাকা'আত পড়ার জন্য। তখন দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতে

হবে । তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে রুকু, সিজদা করে দ্বিতীয় বারের জন্য তাশাহুদের আসনে বসতে হবে । এভাবে সালাত পুরা করে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে হবে ।

৬। জোহর, আছর ও ইশার ফরজ ৪ রাকা'আত করে । প্রথম ২ রাকা'আত ফজরের ২ রাকা'আতের মত আদায় করে আত্তাহিয়াতু পড়তে হবে । সালাম না ফিরিয়ে আল্লাহু আকবর বলে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে এবং শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। এমনি ভাবে চতুর্থ রাকা'আত পড়ে একইভাবে আত্তায়িহাতু সম্পূর্ণ পড়ে ও অন্যান্য দোয়া পড়ে সালাম ফিরাতে হবে ডানে ও বামে ।

৭। বিতরের সালাত ৩ রাকা'আত । প্রথমে ২ রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে । (প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরূণ পড়ার ব্যাপারে সহি হাদিছ সমূহে বর্ণিত আছে ।) অতপর ১ রাকা 'আত আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে । উত্তম হচ্ছে রুকুতে যাবার পূর্বে নিম্নের দুয়ায়ে কুনুত পড়া[1] :

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ (ابو داؤد)

(আল্লাহুম্মা ইহ্‌দিনী ফিমান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনি ফিমান 'আফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফিমান তাওল্লাইতা, ওয়া বারিকলী ফিমা আ'তাইতা, ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা, ফা ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউকদা 'আলাইকা । ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া'ইয্যু মান 'আদাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়াতা 'আলাইতা) । আবু দাউদ, সহীহ্‌ সনদ ।

অর্থাৎ (হে আল্লাহ ! আমাকেও ঐ সমস্ত লোকদের মাঝে সামিল কর যাদের তুমি হেদায়েত দিয়েছ । যাদের সুস্থ রেখেছ আমাকেও ঐ দলে সামিল কর । তুমি যাদেরকে নিজ দায়িত্বে নিয়েছ আমাকেও তাদের দলে সামিল কর । আর আমাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও । আর আমার সম্বন্ধে যদি কোন খারাবী লিখে থাক তা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও । কারণ, তুমিই এগুলো নির্দিষ্ট কর, অন্য কেউ তোমার উপর তা আরোপ করতে পারে না। তুমি যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর তাকে কেউ অপমান করতে পারে না । আর যার সাথে শত্রুতা পোষণ কর সে কখনও সম্মানী হতে পারে না । হে আমাদের রব ! তুমি বরকতময় এবং সুমহান ও উচু ।

---

[1] নোট : এটা সম্ভবতঃ লেখকের নিজস্ব উক্তি । ছহি বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদিসে পাওয়া যায় যে নবী ﷺ সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস পড়ে রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলে সিজদায় যাবার পূর্বে দাঁড়ায়ে কুনুত পড়তেন এবং কুনুত পড়ার পর সিজদায় যেতেন ।

৮। সালাতে ইমামের সাথে যোগ দিতে তাড়াহুড়া করলে চলবে না। বরঞ্চ সালাতে দাঁড়িয়ে তকবীর দিয়ে তারপর রুকুতে যেতে হবে, যদিও ইমাম রুকুতে থাকুন না কেন। তারপর রুকুতে যান, ইমাম রুকু হতে উঠার পূর্বেই যদি আপনি রুকুতে যেতে পারেন তবেই ঐ রাক'আত ইমামের সাথে পেলেন, নচেৎ নয়।

৯। যদি ইমামের সাথে সালাতে যোগ দিয়ে দেখেন যে, ২/১ রাকা'আত ছুটে গেছে তবে ইমামের পিছনে বাকী সালাতে শরীক হন। তিনি সালাম ফিরালে আপনি সালাম না ফিরিয়ে উঠে বাকী রাকা'আত পূর্ণ করুন।

১০। সালাতে তাড়াহুড়া করবেন না। কারণ, তাতে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। একদা রাসূল ﷺ এক ছাহাবীকে সালাতে তাড়াহুড়া করতে দেখলেন। তাকে ডেকে বললেন: *(ফেরত যেয়ে আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি সালাত আদায় করনি। তিনি এভাবে তিনবার বললেন। তৃতীয় বার ঐ ছাহাবী বললেন: হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: রুকু'তে যেয়ে পুরা এতমিনান (স্থিরতা) আনবে। তারপর রুকুর দু'আ শেষে রুকু হতে উঠে ঠিকভাবে সোজা হয়ে দাড়াবে। তারপর সিজদা কর পুরা এতমিনানের সাথে, অতঃপর বসো সম্পূর্ণ সোজা হয়ে ....)*। বুখারী ও মুসলিম।

১১। যদি সালাতের কোন ওয়াজিব ছুটে যায়। যেমন, প্রথম বৈঠকে না বসে থাকেন অথবা কত রাকা'আত আদায় করেছেন তাতে সন্দেহ থাকে, তখন কম সংখ্যক রাকা'আত ধরে বাকী সালাত পূর্ণ করুন। তারপর সালাতের শেষে ২টা সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবেন। একে বলা হয় ছহু সিজদা।

সালাতের উপর কিছু হাদীছ

১) صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ. (رواه البخاري)

অর্থাৎ *(তোমরা ঐভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ)* বুখারী।

২) إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. (رواه البخاري)

(তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে যেন অবশ্যই ২ রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।) বুখারী। [এই সালাতকে তাহইয়াতুল মসজিদ বলে]

৩) لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا. (رواه مسلم)

(তোমরা কবরের উপর উপবেশন কর না, এমনকি তার দিকে সালাতও আদায় কর না)। মুসলিম।

৪) إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ. (رواه مسلم)

(যখন ইকামত হয়ে যায় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অন্য সালাত নেই)। মুসলিম।

৫) أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ ثَوْبًا. (رواه مسلم)

(সালাতে আমাকে হুকুম করা হয়েছে পোষাক না গুটাতে)। মুসলিম। (অর্থাৎ জামার হাতা বা ঝুল না গুটান)।

৬) أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا، وَفِيْ رِوَايَةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. (رواه البخاري)

(তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, একের পা অপরের সাথে মিলিয়ে দাড়াও। অন্য রেওয়ায়েত আছে (ছাহাবীরা বলেন ঃ) আমরা সালাতে একে অপরের কাধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম)। বুখারী।

৭) إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا. (متفق عليه)

(যখন ইকামত হয়ে যায় তখন তোমরা তাড়াহুড়া করে উপস্থিত হয়োনা। বরঞ্চ স্বাভাবিক ও ধীর স্থীর ভাবে হেটে এস। ইমামের সাথে যা পাও তা আদায় কর, আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ কর)। বুখারী ও মুসলিম।

৮) اِرْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. (رواه البخاري)

(এমন ভাবে রুকু কর যাতে এতমিনান আসে, তারপর রুকু হতে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাড়াও। এরপর সিজদা কর এত্মিনানের সাথে)। বুখারী।

৯) إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. (رواه مسلم)

(যখন সিজদা কর, হাতের পাতাদ্বয় মাটিয়ে বিছিয়ে কনুইদ্বয় খাড়া রাখ)। মুসলিম।

১০) إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ (رواه مسلم)

(আমি তোমাদের ইমাম, তাই রুকু ও সিজদাতে আমার আগে আগে যাবে না)। মুসলিম।

১১) أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ . (صحيح رواه الطبراني)

(কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম বান্দার যে হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সালাত। যদি উহা গ্রহণীয় হয় তবে সমস্ত আমলই ঠিক হবে। আর যদি তাতে দোষ ত্রুটি মিলে, তবে সমস্ত আমলেই দোষ ত্রুটি পাওয়া যাবে)। তবরানী, সহীহ।

১২) مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ . (رواه احمد)

(তোমরা তোমাদের সন্তানদের ৯ বৎসর বয়স হতেই সালাতের আদেশ দিতে থাক। যখন ১০ বৎসরে পদার্পণ করবে তখন (সালাত না আদায় করলে) প্রহার করবে। আর তখন হতেই তাদের বিছানা আলাদা করে দাও)। আহমদ, হাসান।

সালাতিল জুম'আ এবং জামা'ত ওয়াজিব

সালাতিল জুম'আ এবং জামা'তে সালাত আদা করা যে ওয়াজিব নিম্নে তার কিছু দলিল পেশ করা হচ্ছে:–

১) আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (الجمعة : ٩)

অর্থাৎ *((হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিন যখন তোমাদের সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন বেচা-কেনাকে পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি আল্লাহ্কে স্মরণ করতে উপস্থিত হও। উহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে))।* সূরা জুমআ, আয়াত ৯।

২) রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ . (صحيح رواه احمد)

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তি অলসতা করে পর পর তিন জুম'আতে উপস্থিত হবে না, আল্লাহপাক তার অন্তরে মোহর (মোনাফেকের) লাগিয়ে দিবেন)।* সহীহ, আহ্মদ।

৩) রাসূল ﷺ আরো বলেন :

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ

فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ ـ (رواه مسلم)

অর্থাৎ *(একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল কিছু যুবককে আমার জন্য লাকড়ি যোগাড় করতে বলি। তারপর ঐ সমস্ত লোকদের ঘরে যেতে ইচ্ছা পোষণ করি যারা কোন ওযর ব্যতীত জামাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ভিতরে রেখেই তাদের ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেই)*। মুসলিম।

৪) রাসূল ﷺ আরো বলেন : *(যে ব্যক্তি আযান শোনার পরেও বিনা ওযরে মসজিদে উপস্থিত হয় না, তার সালাত আদায় হবে না)*। ইবনে মাজা, সহীহ (ওযর হচ্ছে ভয় বা অসুস্থতা)।

৫) এক অন্ধ ছাহাবী (রাঃ) রাসূল ﷺ এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমার ঘরে এমন কেউ নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে পৌঁছাতে পারে। তাই তিনি রাসূল ﷺ কে অনুরোধ করলেন যাতে জামাতে না আসার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়। তখন রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। তারপর যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি আযান শুনতে পা'ও ? বলেন : হাঁ। রাসূল ﷺ তখন বললেন : তাহলে অবশ্যই জামাতে উপস্থিত হও। মুসলিম।

৬) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি এটা চায় যে, আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) সে মুসলিম হিসেবে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে তবে সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হেফাজত করে এবং যেখানে আযান দেয়া হয় সেখানে আদায় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তোমাদের নবী ﷺ এর জন্য যে সুন্নতগুলো নির্দিষ্ট করেছেন তা হেদায়েত স্বরূপ। যদি তোমরা ঘরেই সালাত আদায় করতে থাক, যেমন ভাবে পশ্চাৎপদরা করে থাকে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে ত্যাগ করতে শুরু করবে। আর যখনই তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতকে ত্যাগ করতে থাকবে তখনই গোমরাহ হতে থাকবে। আমরা আমাদের যামানায় দেখেছি, প্রকাশ্য মোনাফেক ছাড়া কেউ জামা'আত তরক করত না। যদি কেউ সালাতে না আসতে পারত তবে তাকে দুই ব্যক্তি সাহায্য করে কাতারে দাড় করিয়ে দিত। মুসলিম।

জুম'আ ও জামা'আতের ফজিলত

১) রাসূল ﷺ বলেন :

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ. ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا. (رواه مسلم)

(যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে উত্তম রূপে গোসল করে জুম'আ পড়তে আসে, তারপর যতটুকু সম্ভব নফল সালাত আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবা শুনে খুবই মনোযোগের সাথে এবং তার পিছনে সালাত আদায় করে, তবে এক জুম'আ হতে অন্য জুম'আ পর্যন্ত তার গুনাহসমূহ এবং অধিক আরও তিনদিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর, যে খুতবার সময় নুড়িকনা ইত্যাদি নিয়ে খেলা করে তার সালাত নষ্ট হয়ে যায়)। মুসলিম।

২) রাসূল ﷺ আরোও বলেন :

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. (رواه مسلم)

(যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে ফরজ গোসলের মত উত্তমরূপে গোসল করে, তারপর মসজিদে গমন করে, সে যেন একটা উট কোরবানী দিল। তার পরে যে ব্যক্তি মসজিদে গমণ করে সে যেন একটা গরু কোরবানী করল। তার পরে যে গমণ করল সে যেন শিংওয়ালা একটা ভেড়া কোরবানী করল। তারও পরে যে গমণ করল সে যেন একটা মুরগী কোরবানী করল। তার পরের জন যেন একটা ডিম দান করল। তারপর যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশ্‌তারা (মালাইকা) খুতবা শুনতে চলে যায়)। মুসলিম।

৩) রাসূল ﷺ বলেন :

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. (رواه مسلم)

(যে ব্যক্তি এশা জামাতে আদায় করে সে যেন অর্ধরাত্র ইবাদতে কাটাল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করল সে যেন পুরা রাত্র ইবাদতে কাটাল)। মুসলিম।

৪) রাসূল ﷺ বলেন : *(যে ব্যক্তি জামাতে সালাত আদায় করে সে ঘরে বা বাজারে উহা আদায় করলে যে সওয়াব পেত তার ২৫ গুণ বেশী সওয়াব পেল। তার কারণ হল, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযু করে তারপর মসজিদে গমণ করে, (আর এতে তার নিয়ত যদি সালাত আদায় করা ছাড়া আর কিছু না হয়) তবে তার প্রতি পদক্ষেপে একটা করে জান্নাতের সম্মানের (মর্যাদার) স্তর উঁচু হতে থাকে আর তার একটা করে গুনাহ মাফ হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। তারপর যতক্ষণ মসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ যেন সে সালাতে রত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওখানে বসা থাকে ফেরেশ্‌তারা (মালাইকারা) তার জন্য মাগফেরাত চাইতে থাকে। তাঁরা বলতে থাকে : হে আল্লাহ্ ! তার উপর দয়া কর। তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ ! তাঁর তাওবা কবুল কর। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যাকে কষ্ট দেয় বা ওযু ভেঙ্গে না যায়)।* বুখারী ও মুসলিম।

আদবের সাথে কিভাবে জুম'আর সালাত আদায় করব

১। জুমআর দিনে নখ কাটব। ওজু করে উত্তমভাবে গোসল করব। উত্তম পোষাক পরিধান করে আতর ব্যবহার করব।

২। ঐ দিন কাঁচা পেয়াজ বা রসুন খাব না। ধূমপান করব না। দাঁতকে পরিষ্কার করব মেসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে।

৩। মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকা'আত তাহ্ইয়াতুল মসজিদের সালাত আদায় করব, এমনকি ইমাম খুতবা দিতে দাঁড়ালেও। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا -

(متفق عليه)

(যদি কেউ জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে ঐ সময়, যখন ইমাম খুতবা দিতে থাকে তখন সে যেন সংক্ষেপে ২ রাকা'আত সালাত আদায় করে।)। বুখারী ও মুসলিম।

৪। তারপর ইমাম খুতবা দিতে শুরু করলে উহা মন দিয়ে শুনব, অন্য কোন কথাবার্তা বলব না।

৫। তারপর ইমামের সাথে ২ রাকা'আত জুম'আর ফরজ আদায় করব।

৬। তারপর ৪ রাকা'আত বা'দাল জুম'আ আদায় করব। অথবা ঘরে ফিরে গিয়ে ২ রাকা'আত আদায় করব। আর ওটাই উত্তম।

৭। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ বেশী বেশী করে নবীর উপর দরুদ পড়ব।

৮। জুম'আর দিনে বেশী বেশী করে দু'আ করব। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন : *(জুম'আর দিনে এমন একটা মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম কোন দু'আ করলে অবশ্যই তা তাকে দিয়ে দেন)।* বুখারী ও মুসলিম।

৯। জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কারণ, রাসূল ﷺ বলেন : *(যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করে; তার জন্য দুই জুম'আর মাঝের সময়টা নূর দিয়ে ভরে দেন)।* হাকেম, বাইহাকী, সহীহ।

১০। রাসূল ﷺ আরো বলেন : *(যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, উহা তার জন্য নূর হবে তার নিকট হতে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত)।* সহীহ, জামে' ছগীর।

অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সালাত আদায় করা ওয়াজিব

হে আমার মুসলিম ভাই ! রোগাক্রান্ত অবস্থাতেও সালাত ত্যাগ করার ব্যাপারে সাবধান হোন। কারণ, উহা আদায় করা আপনার উপর ওয়াজিব। এমনকি আল্লাহপাক যুদ্ধের ময়দানেও সালাত আদায় করা ওয়াজিব করেছেন।

জেনে রাখুন, সালাত আদায়ে রুগীর মনে শান্তির উদ্রেক করবে, আর উহা তার সুস্থতা আনয়নে সহায়তা করবে। আল্লাহপাক বলেন :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - (البقرة : ٤٥)

অর্থাৎ *((তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ছবর ও সালাতের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর))।* সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫।

রাসূল ﷺ প্রায়ই বিলাল (রাঃ) কে বলতেন :

يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا - (رواه ابو داؤد وحسن اسناده)

(হে বিলাল ! সালাতের জন্য ইকামত দাও যাতে আমরা শান্তি পাই)। আবু দাউদ, হাসান সনদ। রুগী যদি মৃত পথযাত্রী হয় তবে তার জন্য উত্তম হল সালাতের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা, আর সালাত ত্যাগ করে পাপী হয়ে মৃত্যু বরণ না করা। আর আল্লাহপাক রুগীদের জন্য সালাতকে সহজ করেছেন। পানি ব্যাবহার করতে অপারগ হলে ওযু বা ফরজ গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে পাক হয়ে সালাত আদায় করবে, এ অবস্থায়ও সালাত ত্যাগকারী হবে না।

আল্লাহপাক বলেন :

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة : ٦)

অর্থাৎ *((যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ মল ত্যাগ করে আসে, অথবা কেউ স্ত্রী সহবাসকারী হও এবং তারপর পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল সমূহ ও হস্তসমূহ মসেহ করে নাও। আল্লাহপাক কক্ষণও তোমাদের কষ্টে ফেলতে চান না। কিন্তু তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত সমূহ তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পার))।* সূরা মায়েদা, আয়াত ৬।

কিভাবে রুগীরা পবিত্রতা হাছিল করবে

১। রুগীর উপর ওয়াজেব হচ্ছে, সে ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করবে ওযুর সাহায্যে এবং বড় নাপাকী হতে পবিত্রতা হাছিল করবে গোসল করে।

২। যদি পানি দিয়ে পবিত্রতা হাছিল করতে সে অসমর্থ হয়, পানির অভাবে, বা রোগ বৃদ্ধির ভয়ে, অথবা রোগ নিরাময়ে দেরী হতে পারে এই আশঙ্কায়, তখন সে তায়াম্মুম করবে।

৩। তায়াম্মুম করার পদ্ধতি : পবিত্র মাটিতে দুই হাত দিয়ে একবার আঘাত করবে, তারপর তালু দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার মসেহ করবে। এর পর এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের কনুইসহ মসেহ করবে, প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত।

৪। যদি সে নিজে নিজে ওযু করতে বা তায়াম্মুম করতে অসমর্থ হয়, তবে অন্য কেউ তাকে ওযু বা তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

৫। যদি তার ওযুর কোন অঙ্গ কাটা থাকে তবে সে উহা পানি দ্বারা ধৌত করবে। যদি পানিতে উহার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে হাত ভিজিয়ে ঐ হাত দিয়ে ঐ স্থানে বুলাবে। যদি তাতেও তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে।

৬। যদি তার ওযুর কোন অঙ্গের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকে, তবে সে উক্ত অঙ্গের উপর পানি দিয়ে মসেহ করবে, ধুবে না। তখন আর তায়াম্মুমের প্রয়োজন নাই। কারণ, ধৌত করার পরিবর্তে মসেহ করা হয়েছে।

৭। দেওয়াল বা অন্য কোন পাক জায়গা যেখানে ধূলাবালি লেগে আছে, সেখানে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যায়। কিন্তু দেওয়ালে যদি তৈলাক্ত কোন পদার্থ থাকে তবে তাতে তায়াম্মুম করা যাবে না।

৮। যদি মাটিতে বা দেওয়ালে বা অন্যত্র তায়াম্মুম করার জন্য ধূলা না মিলে, তবে কোন পাত্রে বা রুমালে ধূলা নিয়ে তাতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যাবে।

৯। যদি কেউ এক ওয়াক্তের সালাতের জন্যে তায়াম্মুম করে, তারপর পাক অবস্থায় অন্য ওয়াক্ত এসে যায় তবে প্রথম বারের তায়াম্মুমই যথেষ্ট। নূতন করে আর তায়াম্মুম করতে হবে না। কারণ, সে তায়াম্মুমের দ্বারা পাক পবিত্র অবস্থায় আছে এবং এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে জন্য তা নষ্ট হয়ে গেছে।

১০। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে নাপাকী হতে তার শরীরকে পবিত্র করা। যদি উহা করতে অসমর্থ হয় তবে ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। ঐ অবস্থার সালাত তার জন্য সহীহ হবে, নূতন করে আর আদায় করতে হবে না।

১১। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে পাক কাপড় পরে সালাত আদায় করা। যদি পোশাকে নাপাকি লাগে তবে তাকে পাক করা তার উপর ওয়াজিব। অথবা অন্য কোন পাক পোশাক পরিধান করবে। অথবা তার উপর কোন পাক পোশাক ব্যবহার করবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয় তবে ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। একে আর পরে নূতন করে আদায় করতে হবে না।

১২। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে কোন পাক স্থানে সালাত আদায় করা। যদি ঐ জায়গা নাপাক হয়ে যায় তবে তাকে ধৌত করা ওয়াজিব। অথবা পাক কোন জিনিসের উপর সালাত আদায় করতে হবে। যদি এগুলোর কোনটা সম্ভবপর না হয় তবে যে ভাবে আছে সেভাবেই সালাত আদায় করবে। এতেই তার সালাত সহীহ হবে, নূতন করে আর আদায় করতে হবে না।

১৩। রুগী কোন অবস্থাতেই পবিত্রতা হাছিল করতে অসমর্থ হলেও ওয়াক্তের সালাত দেরী করে পড়বে না। বরঞ্চ সাধ্যমত পাক হতে চেষ্টা করবে। তারপর নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই সালাত আদায় করবে। এমনকি যদি তার শরীর, পোশাক বা সালাত আদায়ের স্থানে কোন নাপাকী থাকে যা দূরীভূত করতে সে অসমর্থ হয় তবুও।

রুগী কিভাবে সালাত আদায় করবে

১। রুগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফরজ সালাত দাড়িয়ে আদায় করা, যদিও তা ঝুকে আদায় করে বা কোন দেওয়ালে ভর করে বা লাঠিতে ভর করে আদায় করতে হয়।

২। যদি কোন মতেই দাড়াতে সমর্থ না হয়, তবে যেন বসেই আদায় করে। তবে রুকু ও সিজদার সময় মাথা বেশী ঝুকাতে চেষ্টা করবে।

৩। যদি বসেও পড়তে সমর্থ না হয় তবে যেন শয্যায় কাত হয়ে কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে। ডান কাত উত্তম। যদি কোন ক্রমেই সে কেবলা মুখী হতে না পারে তবে যেদিকে মুখ করে সম্ভব সেদিকেই সালাত আদায় করবে। এতেই তার সালাত সহীহ্ হবে, নতুন করে আর আদায় করতে হবে না।

৪। যদি কাত হয়ে সালাত আদায় করাও তার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে কেবলার দিকে পা দিয়ে সালাত আদায় করবে। এই অবস্থায় উত্তম হচ্ছে মাথা কিছুটা উঁচু করে কেবলার দিকে ফিরা। যদি তার পা'ও কেবলার দিকে ফিরান সম্ভবপর না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই যেন আদায় করে। এই সালাত আর নতুন করে আদায় করতে হবে না।

৫। রুগীর জন্য ওয়াজিব হচ্ছে সালাতের মধ্যে রুকু ও সিজদা করা। যদি সে তা করতে সমর্থ না হয় তবে মাথা দ্বারা ইশারা করে উহা আদায় করবে। সিজদার সময় মাথাকে বেশী নীচু করবে। যদি রুকু করতে সমর্থ হয় তবে তা করবে এবং সিজদা করবে ইশারাতে। যদি শুধু সিজদা করতে সমর্থ হয়, তবে তাই করবে এবং রুকু ইশারায় করবে। এই অবস্থায় কোন বালিশের উপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই।

৬। যদি অবস্থা এমন হয় যে, রুকু ও সিজদাতে মাথা দিয়ে ইশারাও করতে না পারে, তবে যেন চোখ দিয়ে ইশারা করে। রুকুর সময় অল্প করে চক্ষু বন্ধ করবে আর সিজদার সময় বেশী করে চোখ বন্ধ করবে। কোন কোন রুগী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। তা সহীহ্ নয়। এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন দলিল নেই। অথবা কোন আলেমের ফতোয়াও নেই এ ব্যাপারে।

৭। যদি মাথা দিয়ে বা চোখ দিয়ে ইশারা করতেও সে অসমর্থ হয় তবে সে অন্তরে অন্তরে সালাত আদায় করবে। তকবীর বলবে এবং সূরা পড়বে, রুকু সিজদাতে দাড়ান ও বসার নিয়ত করবে। কারণ, প্রত্যেকে তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।

৮। রুগীদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, প্রতিটি সালাত সঠিক সময়ে আদায় করবে এবং সাথে সাথে যে সমস্ত ওয়াজিব সমূহ আছে তাও তার সাধ্যমত আদায় করতে চেষ্টা করবে। যদি তার জন্য প্রতিটি সালাত ওয়াক্ত মত আদায় করা কঠিন হয়ে দাড়ায়, তখন জোহর ও আছর এবং মাগরিব ও ইশা একত্র করে পড়বে। হয় আছরকে জোহরের

সাথে এবং এশাকে মাগরেবের সাথে মিলিয়ে "জমা তকদীম" পড়বে অথবা জোহরকে আছরের সাথে পড়বে এবং মাগরেবকে এশার সাথে মিলিয়ে "জমা তা'খীর" পড়বে। যেটা তার জন্য সহজ সেটাই করবে। কিন্তু ফজরের সালাতের কোন জমা নেই আগে বা পরের সালাতের সাথে।

৯। যদি কোন রুগী চিকিৎসার জন্য তার এলাকার বাইরে সফরে থাকে তখন সে চার রাকা'আতের স্বালাত দুই রাকা'আত করে পড়বে (ইশা, জোহর ও আছর) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার দেশে বা শহরে ফেরত আসে। সেই সফরের সময় লম্বাই হোক বা অল্প দিনের জন্যই হোক। (শাইখ মুহাম্মদ ছালেহ ওছাইমিন)

সালাত শুরুর দু'আ সমূহ

১) রাসূল ﷺ সাধারণতঃ ফরজ সালাতের শুরুতে বলতেন:

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (متفق عليه)

অর্থাৎ *(হে আল্লাহ! আমার গুনাহ খাতা আমার থেকে এত দূরে করে দিন যেমন ভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব বানিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ খাতা' হতে আমাকে ঐভাবে পবিত্র করুন, যেমন ভাবে সাদা পোশাককে ময়লা নাপাকি হতে পাক করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ খাতা' সমূহকে পানি, বরফ ও শীল দ্বারা ধৌত করে পাক করে দিন))।* বুখারী ও মুসলিম।

২) রাসূল ﷺ সাধারণতঃ ফরজ ও নফল সালাতে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّيْ، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ - (مسلم)

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ। আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই, আপনিই আমার রব এবং আমি আপনার দাস। নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমার গুনাহও স্বীকার করছি। তাই মেহেরবানী করে আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন। কারণ, আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে আমাকে উত্তম চরিত্রগুণে বিভূষিত করুন। কারণ, আপনি ছাড়া কারো এ ক্ষমতা নেই। আর মেহেরবানী পূর্বক আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন, কারণ উহা করার ক্ষমতা আপনি ছাড়া কারো নেই।

সালাতের শেষের দু'আ

১। রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত দু'আ সালাতের শেষে সালাম ফেরানোর পূর্বে পড়তেন। اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ (رواه مسلم)

অর্থাৎ *(হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব হতে বাঁচতে চাই। আর দুনিয়ার জীবনের ও মৃত্যুর পরের ফিতনা হতে বাঁচতে চাই। সাথে সাথে দজ্জালের নিকৃষ্ট ফিতনা হতে বাঁচতে চাই)।* মুসলিম।

২। এছাড়া তিনি আরও পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ۔ (رواه النسائي)

অর্থাৎ *(হে আল্লাহ্ ! আমি যে সমস্ত খারাপ কার্য করেছি তা হতে ক্ষমা চাই, আর যে সমস্ত খারাবী করিনি, তা হতেও বাঁচতে চাই)।* নাসায়ী, সহীহ।

মৃতদের জন্য সালাত আদায় করার পদ্ধতি (সালাতুল জানাযা)

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতে হবে। তারপর ৪ বার তক্‌বীর দিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

১। প্রথম বার তক্‌বীর বলার পর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।

২। দ্বিতীয় তাক্‌বীরের পর দরূদে ইব্রাহীম পড়তে হবে।

৩। তৃতীয় তাক্‌বীরের পর রাসূল ﷺ হতে যে দু'আ ছাবেত আছে তা পড়তে হবে। তা হল —

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ۔
(رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح)

"আল্লাহুম্মাগ্‌ফীর লিহাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদানা ওয়া গায়িবিনা, ওয়া ছাগীরানা ওয়া কাবীরানা, ওয়া যাকারানা ওয়া উন্‌ছানা; আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা-আহ্‌য়িহি 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান।" আহমদ, তিরমিযি, হাসান সহীহ।

অর্থাৎ *(হে আল্লাহ্! দয়া করে আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকেই ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যাদেরকে জীবিত রেখেছেন তাদের ইসলামের উপর জীবিত রাখুন আর আমাদের যাদের মৃত্যু দান করেন তাদের ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন)।*

তারপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

(হে আল্লাহ! তাদের সওয়াব হতে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং তাদের পর আমাদের ফিৎনাতে লিপ্ত করবেন না)।

৪। চতুর্থ তাক্‌বীরের পর মনে যা চায় সেইভাবে দু'আ করতে হবে এবং ডান দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন

আল্লাহপাক বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. (آل عمران: ١٨٥)

অর্থাৎ *((প্রত্যেক জীবিত প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর তোমরা তোমাদের পুরস্কার ও প্রতিদান পাবে একমাত্র কিয়ামতের দিন। যাকে জাহান্নামের আগুন হতে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, সে'ই কামিয়াব। নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন ধোকার জিনিসে পূর্ণ))।* সূরা আল এমরান, আয়াত ১৮৫।

কবি বলেন ঃ ঐ জিনিস, যার থেকে নিষ্কৃতি নেই, তার জন্য অবশ্যই তৈরী হতে হবে। কারণ, মৃত্যুই হচ্ছে বান্দার শেষ ঠিকানা। হে আল্লাহ্! আপনি তো চিরঞ্জীব, আমি যা গুনাহ্ করেছি তা হতে তওবা করছি, আপনি কবুল করুন। স্থির হয়ে যাবার পূর্বেই (মৃত্যু আসার পূর্বেই) সাবধান হউন! আপনি যদি প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ছাড়াই সফরে বের হন তবে অবশ্যই আফসোস করবেন। যখনই আপনার ডাক পড়বে তখনই দুর্ভাগাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। আপনি কি ঐ সমস্ত বন্ধুদের সাথী হতে চান যারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সাথে নিয়েছেন, আর শুধুমাত্র আপনার হাতই শূন্য?

দুই ঈদের সালাত মুছল্লাতে আদায় করা

১। *রাসূল ﷺ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আয্হাতে মুছল্লাতে বের হতেন। ঐ দিনদ্বয়ে প্রথম যে কাজ করতেন তা হল ঈদের সালাত আদায় করা।* (বুখারী)

২। রাসূল ﷺ বলেন : *(ঈদুল ফিতরের সালাতে প্রথম বার ৭বার এবং শেষবার ৫বার তক্বির দিতে হবে। আর এই দুইবারেই তক্বিরের পর ক্বিরাত পড়তে হবে)।* হাসান, আবু দাউদ।

৩। এক ছাহাবী (রাঃ) বলেন : *আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের মহিলাদের নিয়ে ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আদ্বহা দিবসদ্বয়ে বের হতে নির্দেশ দিতেন। তার মধ্যে থাকত স্বাধীনা মহিলা, হায়েজ ওয়ালা মহিলারা ও পর্দানশীল মহিলারা। তবে হায়েজওয়ালারা দূরে বসে থাকত, সালাতে শরীক হতনা। তারা এই উত্তম জিনিস এবং মুসলিমদের দু'আতে শরীক হত। আমি বললাম : আমাদের অনেকের পর্দা করার মত চাদর নেই, সে কি করবে? তিনি বলতেন : তারা তাদের ভগ্নিদের চাদর পরিধান করবে।* বুখারী ও মুসলিম।

এই হাদীছের শিক্ষনীয় বিষয়

১। দুই ঈদের সালাতের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান রয়েছে। উহা ২ রাকা'আত। প্রথম রাকা'আতের শুরুতে মুছল্লী ৭বার তক্বির বলবে। তারপর দ্বিতীয় রাকা'আতের শুরুতে ৫ বার তক্বির বলবে।

তারপর সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত পড়বে।

২। ঈদের সালাত মুছল্লাতেই আদায় করার হুকুম। আর উহা হচ্ছে মদীনা শরীফের নিকটবর্তী এক নির্দিষ্ট স্থান। রাসূল ﷺ সর্বদা ঐ স্থানে যেয়ে ছাহাবীদের নিয়ে দুই ঈদের সালাত আদায় করতেন। তাদের সাথে বের হতেন বালিকারা এবং যুবতী মহিলারা, এমনকি হায়েজওয়ালীরা পর্যন্ত।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন : এর থেকে এই মাস'আলা ছাবেত হল যে, মুছল্লাতে এই সালাত আদায় করতে হবে। খুব জরুরী ওযর ব্যতীত ইহা মসজিদে আদায় করা ঠিক নয়।

ঈদের দিনে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে তাকিদ

১। রাসূল ﷺ বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا : أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. (متفق عليه)

অর্থাৎ *(ঈদের দিন আমাদের সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে সালাত আদায় করা। তারপর ঘরে ফিরে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এই আমল করল সে আমাদের সুন্নতকে পালন করল। যে সালাতের পূর্বে যবেহ্ করল সে যেন তার পরিবারের জন্য গোশত প্রেরণ করল। আর ইহাতে তার কোরবানীর কোন ইবাদত হল না)।* বুখারী ও মুসলিম।

২। অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেন : *(হে লোকেরা! নিশ্চয়ই প্রত্যেক বাড়ীতে কুরবানী দেওয়া জরুরী)।* আহমদ, হাসান

৩। রাসূল ﷺ আরো বলেন :

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ، فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. (رواه احمد)

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তিকে আল্লাহপাক সামর্থ দিয়েছেন কুরবানী করার, তৎসত্ত্বেও সে যদি তা না করে, তবে সে যেন আমাদের মুছল্লাতে উপস্থিত না হয়)।* হাসান, আহমদ।

এসতেসকার সালাত

১। *রাসূল ﷺ একদা মুছল্লাতে বের হন বৃষ্টির সালাতের জন্য। তারপর বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এর পর কিবলার দিকে মুখ করে ২ রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর চাদর উল্টিয়ে ডান পার্শ্বকে বামে স্থাপন করলেন।* বুখারী।

২। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন : *ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর যামানায় যখন অনাবৃষ্টি হয়েছিল, তখন আব্বাস (রাঃ) এর অছিলায় (দু'আর মাধ্যমে) বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : হে আল্লাহ!(নবীর যামানায়) আমরা নবীর অছিলায় (দু'আয়) আপনার নিকট বৃষ্টি চাইতাম আর আপনিও উহা দিতেন। আর আজ আমরা নবী ﷺ এর চাচা আব্বাস (রাঃ) এর অছিলায় (দু'আয়) বৃষ্টি চাচ্ছি, দয়া করে বৃষ্টিপাত ঘটান। সাথে সাথে বৃষ্টিপাত শুরু হয়।* বুখারী।

এই হাদীছ থেকে আমরা এই দলীল পাচ্ছি যে, ছাহাবী কেরাম (রাঃ)-গণ রাসূল ﷺ এর যামানায় তাঁর নিকট দু'আ চাইতেন বৃষ্টির জন্য। যখন তিনি আল্লাহপাকের নিকট চলে গেলেন, তখন আর তারা তাঁর অছিলায় দু'আ করতেন না। বরঞ্চ রাসূল ﷺ এর চাচা আব্বাস (রাঃ) এর নিকট দু'আ চাইলেন, যিনি জীবিত ছিলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) তাদের জন্য আল্লাহপাকের নিকট দু'আ করলেন।

খুসুফ ও কুসুফের সালাত

১। আয়েশা (রাঃ) বলেন : *রাসূল ﷺ এর যামানায় একদা সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এক ঘোষককে পাঠালেন এই ঘোষণা দিতে যে, সালাতের জন্য একত্রিত হও। তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং ২ রাক'আত সালাতে ৪ বার রুকু ও ৪ বার সিজদা করলেন।* বুখারী।

২। আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল ﷺ এর যামানায় একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। তখন নবী ﷺ ছাহাবীদের নিয়ে সালাতে মগ্ন হন। খুব লম্বা করে কিরাত পড়লেন। তারপর খুব লম্বা করে রুকু করলেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন। তারপর আবার লম্বা কিরাত পড়লেন, তারপর আবার রুকুতে যেয়ে লম্বা সময় অতিবাহিত করলেন। তারপর রুকু হতে সোজা হয়ে দাড়িয়ে সিজদাতে গেলেন।

তারপর দু'বার সিজদা করলেন। তারপর সিজদা হতে দাড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আত আদায় করলেন প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ। সালাম ফিরালেন। ততক্ষণে সূর্য গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এর পর খুতবা দিলেন এবং বললেন : নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে ঘটে না। বরঞ্চ তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত যা আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের দেখান। যখনই তোমরা ইহা দেখতে পাবে তখনই সাথে সাথে সালাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহপাকের নিকট দু'আ করতে থাক, সালাত আদায় করতে থাক এবং দান ছাদ্‌কাহ্ করতে থাক।

হে মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত! কোন বান্দা বা বান্দী যখন যিনা করে তখন আল্লাহপাকের চেয়ে বেশী কারো আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগে না। ওহে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কসম, আমি যা জ্ঞাত আছি তা যদি তোমরা জানতে তবে খুব কমই হাসতে আর বেশী বেশী করে কাঁদতে। ওহে, আমি কি (আমার কথা) পৌঁছিয়েছি ? বুখারী ও মুসলিম।

এস্তেখারার সালাত

জাবের (রাঃ) বলেন : রাসূল ﷺ সর্বদা আমাদের সর্ব কাজের জন্য ঐ রকম ভাবে এস্তেখারা শিখাতেন যেমন ভাবে কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেনঃ যখন কেহ কোন কাজ করতে উদ্যত হও, তখন ২ রাক'আত নফল সালাত আদায় কর। তারপর বল :

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ)
فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ . (رواه البخاري)

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা বিএলমিকা, ওয়া আসতাগফিরুকা বিকুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্‌লিকাল আজীম। ফাইন্নিকা তাকদির ওয়ালা আক্দির। ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু। ওয়া আন্‌তা আল্লামুল গুয়ুউব। আল্লাহুম্মা ইন্‌কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুন লী ফিদীনি ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরি (আও কালা ফি আ'জিলি আমরি ওয়া আজিলি)। ফাকদুরহু লী, ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী, ছুম্মা বারিকলী ফিহে, ওয়া ইন্‌কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন লী ফিদ্দীনি ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরি। ফাছরিফহু আন্নি ওয়াছরিফনী আনহু, ওয়াক্‌দুর লীয়া আল্‌খাইরা হাইসু কানা, ছুম্মা রাদ্দিনী বিহি।" বুখারী।

অর্থাৎ (হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছি আপনার ইলমের অছিলায়, আর আপনার কুদরতী সাহায্য চাচ্ছি আপনার কুদরতের অছিলায়। আর আপনার নিকট চাচ্ছি আপনার মহান ফজলের অছিলায়। নিশ্চয়ই আপনি কর্মক্ষম আর আমি অক্ষম। আপনি জ্ঞাত আছেন, আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই গায়েবের সমস্ত কিছু আপনি জ্ঞাত আছেন। হে আল্লাহ ! যদি আপনি মনে করেন, এই কার্য (এখানে নিজের প্রয়োজন স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দ্বীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে ও পরবর্তী জীবনের জন্য তবে উহাকে আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর উক্ত কার্যে আমাকে বরকত দান করুন। আর যদি মনে করেন এই কার্য (কার্য স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য ক্ষতিকর আমার দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তবে উহাকে আমা হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখুন। আর যে কাজে

আমার মঙ্গল আছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করুন। তারপর আমার উপর রাজী খুশী হয়ে যান)।

সহি হাদিস মতে এই সালাত আদায়ে উত্তম হলো প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা কাফিরুণ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস মিলিয়ে পড়া। এই সালাত ও দু'আ প্রত্যেকে তার নিজের জন্য করবে যেমন ঔষধ নিজেই পান করে, এই নিয়তে যে নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ঐ কাজে তাকে সঠিক রাস্তা দেখাবেন। আর কবুলের নিদর্শন হচ্ছে তার জন্য আছবাব (উপকরণ) সমূহ সহজ করে দিবেন। আর ঐ বেদআতী এস্তেখারা হতে নিজকে হেফাজত করুন যাতে আছে স্বপ্নের উপর নির্ভর করা এবং স্বামী স্ত্রীর নামে হিসাব করা বা অন্যান্য জিনিস যার সম্বন্ধে দ্বীনের কোন নির্দেশ নাই।

সালাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন

রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

যদি কেউ জানত যে, সালাত অবস্থায় কোনো ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাওয়াটা কত বড় অন্যায়, তাহলে তার জন্য উত্তম হত ৪০ (দিন বা বৎসর) অপেক্ষা করা।

আবু নদর (রাঃ) বলেন : আমি জানি না তিনি ৪০ দিন, মাস বা বৎসর বলেছিলেন। (বুখারী)

ইবনে খুজাইমার রেওয়ায়েতে আছে ৪০ বৎসর।

এই হাদীছ সালাত আদায়কারীর সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে যাওয়ার কথা বুঝাচ্ছে। তাতে আছে পাপ ও ভয় প্রদর্শন। সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কি ধরণের পাপ হয় তাহলে ৪০ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু যদি সে সিজদার জায়গার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তাতে কিছু হবে না এটাই হাদীছের ভাষ্য।

আর মুছল্লীর জন্য জরুরী হচ্ছে, সে তার সম্মুখে সুতরার ব্যবস্থা করবে, যাতে করে তার সম্মুখে দিয়ে যাবার সময় অতিক্রমকারী সাবধান হয়ে যায়।

কারণ, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : *(তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাতে দাড়ায় তখন যেন মানুষ হতে সুতরা করে নেয়। তারপরও যদি কেউ সুত্রার ভিতর দিয়ে যেতে*

চায় তবে সে যেন তাকে গলা ধাক্কা দেয়। যদি বাধা না মানে তবে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কারণ সে ব্যক্তি শয়তান)। বুখারী ও মুসলিম। এটা ছহিহ্ হাদীছ যা বুখারীতে আছে। আর এই হাদীছ মসজিদুল হারাম ও মসজিদে রাসূল ﷺ উভয়কেই শামিল করে। কারণ, যখন তিনি এই হাদীছ বলেন তা হয় মক্কায়, না হয় মদীনাতে বলেন। এর দলিল হচ্ছেঃ ফতহুল বারীতে আছেঃ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফে বসে আত্তাহিয়াতু পড়ার সময় তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেন। তারপর বলেনঃ যদি সে বাধা না মানত তবে অবশ্যই তার সাথে যুদ্ধ করতাম।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ এখানে কা'বা শরীফের ঘটনা এজন্য উল্লেখ করা হল যাতে করে লোকেরা এই ধারণা না করে যে, প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে ঐস্থানে মুছল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা ক্ষমার্হ।

২। কিন্তু যে হাদীছে আছে যে, কা'বা শরীফে সুত্রা ছাড়া সালাত আদায় করলে এবং তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন গুনাহ হবে না, তা সঠিক নয়।

৩। বুখারীতে আছে, জুহাইফা (রাঃ) বলেনঃ রাসূল ﷺ হিজরত করতে বের হন এবং মক্কার বাথ্হা নামক স্থানে জোহর ও আছর আদায় করেন ২ রাক'আত করে। তখন তাঁর সামনে ছোট লাঠি প্রোথিত ছিল সুত্রা হিসেবে।

মূল কথাঃ যে স্থানে মুছল্লী সিজদা করে সেই স্থান দিয়ে যাতায়াত করা হারাম। তাতে পাপ হয় এবং শক্ত আযাবের ভয়ও আছে যদি মুছল্লীর সামনে সুত্রা থাকে, তা হারাম শরীফেই হোক বা অন্যত্রই হোক না কেন। কারণ, আমরা পূর্বেই এ সম্বন্ধে কয়েকটা সহীহ্ হাদীছ পেশ করেছি। তবে কেউ যদি প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে অপারগ হয় তবে তার জন্য জায়েয আছে।

রাসূল ﷺ এর ক্বিরাত ও সালাত

১। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۔ (المزمل: ٤)

অর্থাৎ *((আর আপনি কুরআনকে ধীরে ধীরে পড়ুন))।* (সূরা মুয্যাম্মেল, আয়াত ৪।

২। রাসূল ﷺ কখনও তিনদিনের কম সময়ে পুরা কুরআন খতম দিতেন না। সহীহ, তিরমিযি।

৩। রাসূল ﷺ তেলাওয়াতের সময় প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামতেন। যেমনঃ আলহামদু লিল্লাহে রাব্বীল আলামীন বলে থামতেন তারপর আর রাহ্মানির রাহীম বলে থামতেন। সহীহ, তিরমিযি।

৪। রাসূল ﷺ বলেছেন, কুরআনকে সুন্দর করে তেলাওয়াত কর। কারণ, সুন্দর কণ্ঠস্বর কুরআন তেলাওয়াতকে আরো সুন্দর করে তুলে। সহীহ, আবু দাউদ।

৫। রাসূল ﷺ কুরআনকে বেশ টেনে টেনে পড়তেন। সহীহ, আহমদ।

৬। রাসূল ﷺ মোরগের আওয়াজ শুনলে ঘুম হতে উঠতেন। বুখারী ও মুসলিম।

৭। রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে জুতা পায়ে দিয়ে সালাত আদায় করতেন। বুখারী ও মুসলিম।

৮। রাসূল ﷺ ডান হাত দিয়ে তছবীহ গুনতেন। সহীহ, তিরমিযি ও আবু দাউদ।

৯। রাসূল ﷺ এর সম্মুখে যখন কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হত, তখনই তিনি সালাতে মগ্ন হতেন। হাসান, আহমদ ও আবু দাউদ।

১০। রাসূল ﷺ যখন সালাতের মধ্যে বসতেন, তখন হাটুদ্বয়ের উপর হাতের পাতাদ্বয় স্থাপন করতেন। তারপর অনামিকা উঠিয়ে রাখতেন, উহা দ্বারা দু'আ করতেন। মুসলিম।

১১। কখনও কখনও অনামিকা নেড়ে দু'আ করতেন। নাসায়ী, সহীহ।

আর তিনি বললেন : উহা শয়তানের জন্য লোহা দ্বারা আঘাত করা হতেও শক্ত। হাসান, আহমদ।

১২। রাসূল ﷺ সালাতের মধ্যে বুকের উপর, বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করতেন। ইবনে খুজাইমা, হাসান

ইমাম নওভী (রঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন : নাভীর নীচের হাত বাঁধার হাদীছ দুর্বল।

১৩। চার মাযহাবের ইমামগণই বলেছেন, যদি হাদীছ সহীহ হয় তবে উহাই আমার মাযহাব। এর থেকে এটা ছাবেত হল যে, সালাতে অনামিকা নাড়ান, বুকের উপর হাত বাঁধা তাদের মাযহাব। আর উহা সালাতের সুন্নত।

১৪। সালাতে আঙ্গুল নাড়ানোর আমল গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং কিছু কিছু শাফেয়ী মাযহারের লোকেরা। আর আগের হাদীছে রাসূল ﷺ আঙ্গুল নাড়ানোর হিকমত উল্লেখ করেছেন। কারণ, এই নাড়া আল্লাহর তাওহীদের দিকে ইশারা করে। আর এই নড়াচড়া শয়তানের জন্য লোহার আঘাত হতেও শক্ত। কারণ, সে তাওহীদকে অপছন্দ করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী হল, সে রাসূল ﷺ কে অনুসরণ করবে। তাঁর কোন সুন্নতকে অস্বীকার করবে না।

কারণ, রাসূল বলেছেন : তোমরা ঐভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ। বুখারী।

রাসূল এর ইবাদত

১। আল্লাহ্‌পাক বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . (المزمل ١-٢)

অর্থাৎ *((হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি ! উঠুন, ইবাদত করুন, রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ে))।* সূরা মুয্‌যাম্মেল, আয়াত ১, ২।

২। আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূল রমযান বা অন্য কোন সময়ে রাত্রে ১১ রাকা'আতের বেশী তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না। প্রথমে ৪ রাকা'আত পড়তেন। তা যে কত সুন্দর ও লম্বা হত তা বলার মত নয়। তারপর আরও ৪ রাকা'আত পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা বলার ভাষা নেই। তারপর ৩ রাকা'আত পড়তেন। আমি বললাম : আপনি কি বিত্‌র পড়ার পূর্বেই নিদ্রা যান। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায় কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। বুখারী ও মুসলিম।

৩। আসওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ (রঃ) বলেন :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ (اغْتَسَلَ) وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

একদা আমি আয়েশা (রাঃ) কে রাসূল এর রাত্রির সালাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি বলেন : প্রথম রাতে তিনি নিদ্রা যেতেন। তারপর জাগ্রত হতেন। শেষ রাত হলে বিত্‌র আদায় করতেন। এরপর বিছানায় যেতেন। অতঃপর যদি ফরজ গোসলের প্রয়োজন হত তবে গোসল করতেন। তা না হলে, ওযু করতেন এবং সকালের সালাতের জন্য বের হতেন। বুখারী ও মুসলিম।

৪। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : রাসূল সালাতে এত অধিক সময় দাড়িয়ে থাকতেন যে দু' পা ফুলে উঠত। তখন তাঁকে বলা হল : হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি এত ইবাদত করেন, অথচ আল্লাহ্‌পাক আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন : আমি কি শুকুর গুজার বান্দা হব না ? বুখারী ও মুসলিম।

৫। রাসূল বলেন : *(তোমাদের দুনিয়ার নিম্নোক্ত জিনিস সমূহ আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছে : মেয়ে মানুষ, আতর এবং আমার চোখের শীতলতা দেওয়া হয়েছে সালাতের মধ্যে)।* ছহিহ, আহ্‌মদ।

যাকাত ও ইসলামে তার গুরুত্ব

কিছু সংখ্যক লোকের উপর শর্ত সাপেক্ষে ও নির্দিষ্ট সময়ে যাকাত ওয়াজিব। যাকাত হচ্ছে ইসলামের রোকন সমূহের একটা রোকন এবং তার ভিত্তি স্বরূপ। আল্লাহপাক কুরআনের বহু আয়াতে সালাতের সাথে সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

উহা যে ফরজ তা মুসলিমরা এজমা করেছেন খুবই শক্তভাবে। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে তাকে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষেত্রে কৃপনতা করবে, বা কম করবে সে ঐ সমস্ত জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সম্বন্ধে কঠিন আযাব ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

উপরোক্ত কথার দলীল সমূহ ঃ

আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ . (البقرة: ١١٠)

অর্থাৎ *((এবং সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর))*। সূরা বাকারাহ, আয়াত ১১০। আল্লাহ্পাক আরো বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - (البينة: ٥)

অর্থাৎ *((তাদেরকেতো এ হুকুম করা হয়েছে সঠিক ভাবে এখলাছের সাথে আল্লাহপাকের ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত আদায় করতে। আর এই দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত))*। সূরা বাইয়েনাহ, আয়াত ৫।

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ *রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। তার মধ্যে যাকাত আদায় করা একটি*। বুখারী ও মুসলিম।

মায়াজ ইবনে জবল (রাঃ) কে যখন রাসূল ﷺ ইয়ামেনে পাঠান তখন তাকে যে উপদেশ দেন তার মধ্যে আছে ঃ যদি তারা তোমার ঐ কথা মেনে নেয় তবে তাদের জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর কিছু ছাদাকাহ্ ফরজ করেছেন। তা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বিলি করা হবে। বুখারী।

যারা যাকাত আদায় করবে না, তারা যে কুফরি করল এ সম্বন্ধে আল্লাহপাক বলেন ঃ

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ - (التوبة: ١١)

অর্থাৎ *((যদি তারা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই))।* সূরা তওবাহ, আয়াত ১।

এই আয়াত হতে এ কথা পরিষ্কার হচ্ছে যে, যারা সালাত আদায় করবে না এবং যাকাত প্রদান করবে না তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই নয়। বরঞ্চ তারা কাফির। এজন্য আবু বকর (রাঃ) ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন যারা সালাত ও যাকাতকে আলাদা করেছিল এবং সালাত কায়েম রেখেছিল কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আর সমস্ত ছাহাবী কেরাম তাঁর ঐ জিহাদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

যাকাতের হিক্‌মত

যাকাতকে যে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে বহু হিকমত রয়েছে। আর তার উদ্দেশ্যও অত্যন্ত উঁচু, উপকারও প্রচুর। যখন আমরা কুরআন ও হাদীছ পর্যালোচনা করব তখন এগুলো আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হবে। যাকাত কাকে কাকে দিতে হবে এ সম্পর্কে সূরা তাওবা এবং অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ছাদাক্বাহ্ (যাকাত) দেয়ার ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের ভাল কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতেই আল্লাহ তা'য়ালার হিকমতগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠে।

১। উহা মুমিনদের অন্তরকে নানা ধরণের পাপ গুনাহ হতে পরিষ্কার করে এবং খারাপ কার্যের আছর হতে অন্তরকে পরিষ্কার করে। আর তার রুহকে কৃপনতার খারাবি এবং টাকা পয়সার প্রতি অত্যধিক লোভ এবং এই লোভের কারণে অন্যান্য যে খারাবি হয় তা হতে অন্তরকে পাক পবিত্র করে।

আল্লাহ্‌পাক বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (التوبة، ١٠٣)

অর্থাৎ *((তুমি তাদের মাল দৌলত হতে ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর এবং এভাবে তাদের পবিত্র কর এবং তাদের অন্তরকে সংশোধন কর))।* সূরা তাওবাহ্, আয়াত ১০৩।

২। গরীব মুসলিমদের সাহায্য করা, তাদের চাহিদা মেটান, তাদের সহায়তা ও এক্‌রাম করা যাতে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট সাহায্য চেয়ে নিজেদের অপমানিত না করে।

৩। সেই রকম, ঋণগ্রস্ত মুসলিমের ঋণ শোধ করে দিয়ে তার মনের পেরেশানী দূর করা এবং যারা ঋণভারে ভারাক্রান্ত তাদের বোঝা লাঘব করা।

৪। নানা ধরণের অন্তরকে ঈমান ও ইসলামের উপর একত্রিত করা যাতে তারা বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ ও মনের ধোকা হতে বাঁচতে পারে ঈমানের দৃঢ়তা আসার পূর্বেই। ফলে আস্তে আস্তে তাদের ঈমানের মধ্যে দৃঢ়তা আসবে এবং পরিপূর্ণ ইয়াকীন পয়দা হবে।

৫। সাথে সাথে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে তাদের প্রস্তুত করা। তাদের দরকারী জিনিস ও হাতিয়ারের বন্দোবস্ত করা যাতে তারা ইসলাম প্রচার করতে পারে। আর কুফরি ও ফিৎনা ফাসাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। আর সাথে সাথে ন্যায়ের পতাকাকে মানুষের মধ্যে সমুন্নত রাখতে পারে। ফলে সমাজে কোন ফিৎনা দেখা দিবে না, বরঞ্চ দ্বীন সম্পূর্ণ ভাবে এক আল্লাহর জন্যই হবে।

৬। যখন কোন মুসাফির মুসলিম, যাত্রা পথে বিপদে পড়ে এবং তার যাত্রার শেষে ঘরে ফিরার মত টাকাকড়ি না থাকে তখন তাদের ঐ পরিমাণ যাকাতের মাল দেয়া, যা দিয়ে তারা তাদের ঘরে ফেরত যেতে পারে।

৭। সম্পদকে পবিত্র করা, তাকে বৃদ্ধি ও হেফাজত করা এবং তাকে নানা ধরণের বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহপাকের আনুগত্য ও তাঁর হুকুমের উপর চলার বরকত পাওয়া যাবে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ইহ্সান করা হবে।

এগুলো হচ্ছে যাকাত আদায়ের হিকমতের এবং মহান উদ্দেশ্যের কয়েকটা। এ ছাড়া উহা আদায়ে আরও অনেক উপকার আছে। কারণ, শরীয়তের হুকুমের গোপন রহস্য ও হিকমত পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

যে সমস্ত মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিব

চার ধরণের জিনিসের জন্য যাকাত দেয়া ওযাজিব :-

প্রথম : জমিনের ভিতর হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল বের হয় উহার যাকাত।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. (البقرة ٢٦٧)

অর্থাৎ *((হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যে সমস্ত পবিত্র জিনিস উপার্জন করেছ তা হতে দান কর। আর জমিন থেকে আমি যে জিনিস বের করেছি তা হতেও। তবে এর মধ্য হতে শুধু খারাপ জিনিসগুলো দান করো না। যদি এ ব্যাপারে গাফিলতী না কর তবে আর তোমরা দোষী হবে না))।* সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৬৭।

আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন :

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. (الانعام : ١٤١)

অর্থাৎ *((আর তোমরা ফসলের হক সমূহ আদায় কর যেদিন ফসল কর্তন কর সেদিনই))।* সূরা আনআম, আয়াত ১৪১। মালের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে যাকাত।

রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূগর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার ওপর $\frac{১}{১০}$ ভাগ দিতে হবে যাকাত স্বরূপ। আর যে ফসল সেচের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাতে $\frac{১}{২০}$ ভাগ যাকাত দিতে হবে। বুখারী

দ্বিতীয় : সোনা, রুপা ও নগদ টাকার যাকাত।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة : ٣٤)

অর্থাৎ *((যারা সোনা, রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও))।* সূরা তাওবা, আয়াত ৩৪।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন :

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ. (مسلم)

অর্থাৎ *(যদি সোনা বা রুপার অধিকারী কোন ব্যক্তি উহাদের হক (যাকাত) ঠিকমত আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধাতুকে পাত বানান হবে আর তাকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, তারপর তা দিয়ে তার কপালে, শরীরের পার্শ্বে ও পিঠে ছেঁক দেয়া হবে। যতবারই উহা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, ততবারই উহা গরম করে ছেঁক দেয়া হবে, এমন এক দিনে যা হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। এভাবেই এ আযাব চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের বিচার শেষ হয়)।* সহীহ্ মুসলিম।

তৃতীয় : ব্যবসার জিনিসের যাকাত।

উহা হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিস যা ব্যবসা বানিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন, জায়গা জমিন, পশু, খাদ্য, পানিয়, গাড়ী ও এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ। ব্যবসায়ী যখন তার বৎসর শেষ হবে তখন সমস্ত জিনিসের দাম হিসাব করবে। তারপর যে দাম আসে তার $\frac{১}{৪০}$ অংশ বের করবে। তখন ঐ জিনিসের দাম খরিদ মূল্যাই হউক বা কম

দা বেশী যাই হোক না কেন। ঐ সমস্ত মুদি, গাড়ী, টায়ার, টিউব ইত্যাদি প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাদের দোকানে ছোট বড় জিনিস যা আছে তার তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করা। তারপর ঐ হিসাব মত যাকাত আদায় করতে হবে। তবে হাঁ, যদি এই কাজ তার উপর খুবই কষ্ট দায়ক হয় তবে একটা পরিমাণ করে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

চতুর্থ ঃ গবাদী পশু

উহাদের মধ্যে শামিল হল উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। তবে এতে শর্ত হল, এগুলি মাঠে চরা পশু হতে হবে এবং এগুলির দুধ কিংবা আর্থিক লাভের জন্য পালন করা হবে। আর তাদের নেছাব পূর্ণ হতে হবে। মাঠে চড়ার শর্ত হল, সমস্ত বৎসর বা বৎসরের বেশীর ভাগ সময় চড়তে হবে। তা যদি না হয় তবে আর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যদি ব্যবসায়ের জন্যে প্রতিপালন করা হয়, তবে যাকাত দিতে হবে। যদি তাদের পালন করা হয় ব্যবসার জন্য তবে তা মাঠেই চড়ানো হোক কিংবা ঘরেই ঘাস খাক, তার যাকাত হবে ব্যবসার জিনিসের মতই। ব্যবসার এই নেছাব, হয় নিজে ঐ মালেই হবে অথবা অন্য জিনিসের সাথে মিলিয়ে হতে হবে।

নেছাবের পরিমাণ

১। **ফসল ও ফল ঃ** এর নেছাব হল পাঁচ আওছাক বা ৬১২ কেজি (কিলো গ্রাম)। আর যদি সেচ ছাড়াই উৎপাদিত হয় তখন $\frac{১}{১০}$ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা উৎপন্ন হলে $\frac{১}{২০}$ ভাগ যাকাত দিতে হবে।

২। **নগদ টাকা বা সোনা, রুপা ইত্যাদির যাকাত ঃ-**

ক) সোনা ঃ- ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম পরিমাণ ওজন হলে তাতে ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা ২$\frac{১}{২}$ (আড়াই) ভাগ।

খ) রুপা ঃ- উহা যখন ৫৯৫ গ্রাম হবে তখন শতকরা ২$\frac{১}{২}$ (আড়াই) ভাগ যাকাত দিতে হবে।

গ) নগদ টাকা ঃ- উহা সোনা বা রুপা যে কোন একটার নেছাব সমান নগদ টাকা থাকলেই যাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ।

৩। **ব্যবসার মাল ঃ-** সোনা বা রুপার হিসাবে দাম হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা দিতে হবে।

৪। গবাদী পশু ঃ–

ক) উট ঃ– উহার সর্ব নিম্ন পরিমাণ হল ৫ টা। উহাতে যাকাত দিতে হবে ১টা ছাগল।

খ) গরু ঃ– উহার সর্ব নিম্ন নেছাব হল ৩০ টা। উহাতে যাকাত দিতে হবে ১ বছরের একটি বাছুর।

গ) ছাগল ঃ– উহার সর্ব নিম্ন নেছাব হল ৪০টা। উহাতে দিতে হবে ১টা ছাগল।

এই সমস্ত পশুর নেছাব ও যাকাত সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে ফেকাহ্‌র কিতাব দেখতে হবে।

পশুর উপর তখনই যাকাত ওয়াজিব হবে যখন এগুলো পুরা বৎসর মাঠে চড়ে খাবে।

যাকাত ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ

১। ইসলাম ঃ– যাকাত কাফির বা মুরতাদের উপর ওয়াজিব নয়।

২। যে মালের যাকাত দিতে হবে তাতে তার পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। তা তার হাতের মধ্যে থাকতে হবে আর তা খরচ করার পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে অথবা কেউ নিলেও তা ফেরত পাবার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

৩। নেছাব পূর্ণ হতে হবে ঃ– শরীয়তে বিভিন্ন মালের জন্য যে নেছাব দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ হতে হবে।

৪। বৎসর পূর্ণ হতে হবে ঃ– যেদিন থেকে সে নেছাবের মালিক হল সেদিন হতে এক বৎসর পূর্ণ হতে হবে। তবে ফসলের ক্ষেত্রে যেদিন উহা পেকে যাবে সেদিন হতেই উহা গণ্য হবে। তবে গবাদী পশুর বংশ বৃদ্ধি পেলে এবং ব্যবসার লাভ হলে তা মূলের সাথে সংযুক্ত হবে।

৫। স্বাধীনতা ঃ– কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কারণ সে কোন সম্পদের অধিকারী নয়, বরঞ্চ সে তার মালিকের সম্পদ দেখাশুনা করে।

৬। ঐ গবাদী পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না যা মালিক নিজ সম্পদ দ্বারা প্রতিপালন করেন। যেমন, পশুকে যদি তার খাদ্য কিনে খাওয়াতে হয় তাহলে ঐ পশুর উপর যাকাত হবে না।

যাকাত কোথায় ও কাকে দিতে হবে

যাকাত কোথায় ব্যয় করতে হবে এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক বলেন :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . (التوبة : ٦٠)

অর্থাৎ *((ছাদ্‌কাহ পাবার যোগ্যতা রাখে শুধুমাত্র ফকির, মিসকিন, যাকাত সংগ্রহকারী, যাদের অন্তর (ইসলামে) ঝুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে, আর ক্রীতদাস মুক্তিতে, ঋণগ্রস্তরা, আর যারা আল্লাহ্‌পাকের রাস্তায় আছে, আর রাস্তার পথিক। ইহা আল্লাহর তরফ হতে ফরজ। আল্লাহ্‌পাক সমস্ত কিছু জ্ঞাত আছেন, আর তিনি হিকমতওয়ালা))*। সূরা তাওবা, আয়াত ৬০।

(ছাদাকাহ্‌ বলতে এ আয়াতে ফরজ যাকাতকে বুঝাচ্ছে) আল্লাহ্‌পাক এ আয়াতে ৮ ধরণের লোকের কথা বলেছেন যাদের প্রত্যেকেই যাকাত পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

১। **ফকির :–** ঐ ব্যক্তি, তার যা প্রয়োজন, তার অর্ধেকেরও তিনি মালিক নন। অথবা তার থেকেও কম। তিনি মিসকিনের থেকেও বেশী অভাবী।

২। **মিসকিন :–** ঐ ব্যক্তি অভাবী, কিন্তু ফকিরের থেকে উত্তম। যেমন তার প্রয়োজন ১০টাকার, তার নিকট আছে ৭ টাকা। ফকির যে মিসকিনের থেকেও বেশী অভাবী তার দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের কথা —

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ . (الكهف : ٧٩)

অর্থাৎ *((আর ঐ নৌকা যা ছিল কয়েকজন মিসকিনের, যারা সমুদ্রে কাজ করত))*। সূরা কাহাফ, আয়াত ৭৯।

আল্লাহ্‌পাক এ আয়াতে তাদের মিসকিন বলেছেন যদিও তারা একটা নৌকার মালিক ছিলেন। ফকির ও মিসকিনদের এই পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তাদের পুরা বৎসর চলে যায়। কারণ, যাকাত প্রত্যেক বৎসরই ওয়াজেব হয়, তাই সে পূর্ণ এক বৎসরের মাল নিবে)

কতটা সাহায্য প্রয়োজন : উহাতে শামিল হল খানা, পোশাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য জিনিস যা ছাড়া বাঁচা সম্ভবপর নয়, তবে কোন অতিরিক্ত খরচ করা চলবে না। আর যার নিকট হতে সে যাকাত পাবে তার উপর সে বোঝা স্বরূপ হতে পারবে না। এই জন্য এই পরিমাণ এক এক যামানায়, এক এক এলাকায় ও ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়। যা এখানে এক ব্যক্তির চলে অন্যত্র হয়ত অন্য ব্যক্তির তাতে চলবে না। যা হয়ত অনেকের ১০ দিনের জন্য যথেষ্ট, তা হয়ত অন্য কারো এক দিনের খরচ। যাতে এই ব্যক্তির চলে তাতে অন্যের চলবে না, কারণ তার পরিবারিক খরচ বেশী।

আলেমগণ ফতোয়া দেন যে, পূর্ণ প্রয়োজনীয়তার মধ্যে শামিল আছে রুগীর চিকিৎসা, অবিবাহিতের বিবাহ, কিতাব পত্র খরিদ ইত্যাদি।

ফকির ও মিসকিনদের মধ্যে যারা যাকাত নিবে তাদের অবশ্যই মুসলিম হতে হবে, বনু হাশেম এবং তাদের সাথে সংযুক্ত লোকেরা হবে না। আর যাদের উপর খরচ করা তার জন্য লাযেম তাদের যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন পিতা-মাতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী। আর যার পক্ষে উপার্জন করার মত শক্তি আছে, তার জন্য যাকাত নেয়া জায়েয নয়। কারণ রাসূল ﷺ বলেন: ধনী বা কর্মক্ষম যারা তাদের এতে কোন অংশ নেই। আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, সহীহ।

৩। যাকাত আদায়কারী:- তারা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তিবৃন্দ যাদেরকে দেশের ইমাম বা তার নায়েব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাকাতের মাল সম্পদ জমা করা, হেফাজত করা এবং তা বণ্টন করার জন্য। তাদের মধ্যে আছে মাল জমাকারী, হেফাজতকারী, লেখক, হিসাবরক্ষক, পাহারাদার, একস্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহনকারী, এবং যারা উহা বিলি-বণ্টন করে তারাও।

তাদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী বেতন দেয়া হয়, যদিও সে ধনী হোক না কেন, যদি সে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী এবং কর্মপটু হয়। যদি তিনি বনু হাশেম গোত্রের হন তবে তাকে যাকাতও দেয়া যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয়ই যাকাত ও ছাদাকাহ্ মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধরদের জন্য নয়।)) মুসলিম।

৪। **যাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুকেছে:** তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা যাদেরকে বংশের লোকেরা মান্য করে এবং আশা করা যায় যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। অথবা তার ঈমানী শক্তি এবং ইসলাম গ্রহণ উদাহরণ হবে অন্যদের সম্মুখে, অথবা মুসলিমদের রক্ষা বা তার ক্ষতি হতে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

তাদের সাহায্য করা এখনও চলছে, এটা মনসুখ (বাতিল) হয়নি। তাদেরকে যাকাত হতে এমন পরিমাণ মাল দেয়া হবে যাতে তারা ইসলামের প্রতি ঝুকে পড়ে, তাকে সাহায্য করে এবং কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তার বিরোধিতা করে। এই অংশ কাফেরকেও দেয়া চলে। কারণ রাসূল ﷺ ছফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে হুনাইন যুদ্ধের গানিমত দিয়েছিলেন। আর এটা মুসলিমকেও দেয়া চলে। কারণ রাসূল ﷺ আবু ছুফিয়ান ইবনে হারবকে দিয়েছিলেন। তেমনি ভাবে আল আক্বরা ইবনে

হাবেসকেও দিয়েছিলেন। তারপর উয়াইনাহ্ ইবনে হিছানকেও দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি একশত করে উট দিয়েছিলেন। (মুসলিম)

৫। **ক্রীতদাস মুক্তিতে :-** এর মধ্যে শামিল আছে দাসদের মুক্ত করা। যারা মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিনামা লিখেছে তাদেরও সাহায্য করা। তারপর যারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, তাদেরও মুক্ত করা। কারণ, এ ব্যক্তি ঐ ঋণগ্রস্থদের দলে শামিল হবে যাকে ঋণের বোঝা হতে মুক্ত করা হয়। সাহায্য করা তাকে আরও বেশী উচিত এজন্য যে, হয়ত শত্রুরা তাকে হত্যা করবে অথবা অত্যাচারের কারণে সে ইসলাম ত্যাগ করবে।

৬। **ঋণগ্রস্ত :-** তারা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তিরা যারা দেনা করেছেন এবং শোধ করার ওয়াদা করেছেন। দেনা দুই রকমের হতে পারে :-

(১) কোন ব্যক্তি তার জায়েয প্রয়োজনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। যেমন তার খরচ চালানোর অথবা পোষাক ক্রয় বা বিয়ে বা চিকিৎসার জন্য, অথবা বাড়ী নির্মাণ বা আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করেছে। অথবা অন্য কারো কোন জিনিস ভুলক্রমে অথবা বেখেয়ালে নষ্ট করেছে। তখন তাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেয়া হবে, যাতে সে ঋণমুক্ত হতে পারে। হয়ত সে আল্লাহ্ পাকের কোন হুকুম পালনের জন্য বা মুবাহ্ কোন কাজ করার জন্য ঋণ করেছে।

এই দলে শামিল হতে হলে তাকে মুসলিম হতে হবে, এমন ধনী হওয়া চলবে না যাতে সে তার ঋণ নিজেই শোধ করতে পারে। তার ঋণ গ্রহণ কোন পাপ কাজের জন্য হয়নি। আর ঋণের শর্ত যদি এমন হয় যে, ঐ বৎসর তা শোধ করতে হবে। উহা এমন কোন ব্যক্তির জন্য হবে যাকে আটকানোর ভয় আছে।

(২) অপরের উপকার করতে ঋণগ্রস্ত হওয়া : যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করতে। আর এই ক্ষেত্রে যাকাতের টাকা নেয়া যাবে। কারণ, কুবাইছাহ্ ইবনে হিলালী (রাঃ) বলেন : আমি কোন ব্যক্তির ঋণের বোঝা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর রাসূল (ﷺ) এর নিকট এসে তাকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : তুমি এখানেই থেকে যাও যতক্ষণ না আমাদের নিকট যাকাত ছাদাকার টাকা আসে। তখন তোমার ঋণ শোধের জন্য মাল দিতে বলব।

তারপর বললেন : হে কুবাইছাহ্! পরের নিকট ভিক্ষা করা তিন ধরণের লোক ছাড়া অন্যের জন্য জায়েয নয়। যখন কোন ব্যক্তি অন্যকে উপকার করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে তখন তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা হালাল। যখন উহা শোধ হয়ে যাবে, তখন আর সওয়াল করবে না।

(দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যার এত বেশী প্রয়োজন পড়েছিল যে, টাকা ধার ছাড়া চলে না, তখন তার জন্য সওয়াল করা হালাল যাতে করে সে কোনক্রমে বাঁচতে পারে। (তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি যাকে অভাব পাকড়াও করেছে। তারপর অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, তার কওমের কমপক্ষে তিনজন বুদ্ধিমান লোক বলেছে সত্যিই ঐ ব্যক্তি অন্নকষ্টে পড়েছে। তখন বাঁচার তাগিদে তার জন্য সওয়াল করা জায়েয হবে। এর বাইরে যে সমস্ত সওয়াল করা হবে, কুবাইছাহ্ ! তা হারাম। এ ধরণের সওয়ালকারী হারাম দ্বারা পেট পূর্ণ করে)। (আহমদ ও মুসলিম)

যাকাতের মাল দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণও শোধ করা যায়। কারণ এক্ষেত্রে মালিকত্ব শর্ত নয়। এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। কারণ, আল্লাহপাক তাদের পক্ষে যাকাত নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের জন্য নয়।

৭। **আল্লাহ্র রাস্তায় :-** ঐ সমস্ত লোক যারা দ্বীনের কাজ করে, সরকারী তহবিল হতে কোন বেতন না নিয়ে। এই দলে গরীব ও ধনী উভয়েই শরিক হবে। এতে আরো আছে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তারাও। এতে অন্যান্য উত্তম কাজ শামিল হবে না। কারণ, আয়াতে এই দলকে আলাদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে পূর্বের দলগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্লাহ্র রাস্তায় সমস্ত ধরণের জিহাদ শামিল হবে। যেমন চিন্তাভাবনার দ্বারা জিহাদ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি। আর যারা নানা ধরণের সন্দেহের দোলায় দুলছে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্যও। যে সমস্ত ধ্বংসকারী দল ইসলামের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে। যেমন প্রয়োজনীয় ইসলামী গ্রন্থ ছাপিয়ে বিলি করা, ভাল বিশ্বাসী ও মুখলেছ লোকদের নিযুক্ত করা এবং খৃষ্টান ও নাস্তিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন : *(তোমরা মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর জান, মাল এবং কথার দ্বারা)।* আবু দাউদ, সহীহ সনদ।

৮। **রাস্তার পথিক :-** ঐ মুসাফির, যে তার দেশ হতে অন্য দেশে গেছে, কিন্তু টাকার অভাবে নিজ গৃহে ফেরত যেতে পারছে না। তাকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া হবে যাতে করে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার এই সফর কোন পাপের জন্য হতে পারবে না।

বরঞ্চ কোন ওয়াজিব, মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজের জন্য হতে হবে। আরোও শর্ত হল, যদি সে কোথাও থেকে কর্জ পায় তবে সে যাকাত নিতে পারবে না। ঐ ধরণের

মুসাফির যারা বহুদিন অন্য দেশে থাকে, তার কোন প্রয়োজনে তাকেও যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

পরিশিষ্ট ঃ

যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্ত ধরণের লোকদেরই দিতে হবে তা শর্ত নয়। বরঞ্চ মুস্তাহাব হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা দেখে আদায় করা। এটা লক্ষ্য করবেন দেশের ইমাম বা তার প্রতিনিধি বা যিনি যাকাত দিবেন তিনি।

কারা যাকাত পাবার যোগ্য নয় ?

১। ধনী ও যারা কর্মক্ষম।

২। যাকাত দানকারীর বাপ, দাদা, সন্তান-সন্ততী এবং স্ত্রী। (যদি তারা দরিদ্র হয় এবং তার বাড়ীতেই থাকে)

৩। অমুসলিম

৪। রাসূল ﷺ -এর বংশধর

যদি বাপ, মা এবং সন্তান-সন্ততী দরিদ্র হন এবং তারা আলাদা বসবাস করেন তবে তাদের যাকাত দেয়া যাবে। আর তিনি যদি তাদের ভরণপোষণে অসমর্থ হন তখন তাদের খরচ চালান তার উপর ওয়াজিব নয়। সমস্ত ধরণের আত্মীয়-স্বজনদের যাকাত দেয়া যাবে তবে শর্ত হল তার মূল (বাপ, দাদা) ও শাখা প্রশাখা (সন্তান-সন্ততী) হতে পারবে না।

আর ধনী হাশেমদের তখন দেয়া যাবে যখন তারা গনীমতের মাল পাবে না। তখন তাদের হাজত ও জরুরত দেখে দেয়া হবে।

যাকাত আদায়ের উপকারিতা

১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর হুকুম প্রতিপালন করা। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল ﷺ যা ভালবাসেন তাকে নফসের যে ভালবাসা আছে সম্পদের প্রতি, তার উপর প্রাধান্য দেয়া।

২। এই আমলের ছওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ . (البقرة : ٢٦١)

অর্থাৎ *((যারা আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ শষ্য দানার মতো যার থেকে ৭টা শিষ বের হয় আর প্রতিটি শিষে শতাধিক দানা হয় আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বাড়িয়ে দেন))*। সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৬১।

৩। ছাদ্‌কাহ তার জন্য ঈমানের প্রমাণ স্বরূপ এবং তার ঈমানের নিদর্শন। হাদীছ শরীফে আছেঃ

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (رواه مسلم)

"ছাদকাহ্ বোরহান (দলীল) স্বরূপ"। মুসলিম।

৪। ইহা মানুষকে পাপের ও চরিত্রের খারাবী হতে পবিত্র করে। আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. (التوبة : ١٠٣)

অর্থাৎ *((আপনি তাদের মাল সম্পদ হতে ছাদ্‌কাহ গ্রহণ করুন যাতে তারা পাক পবিত্র হয়))*। সূরা তাওবাহ্, আয়াত ১০৩।

৫। সম্পদের বৃদ্ধি, বরকত হওয়া, হেফাজত ও খারাবী থেকে বেঁচে থাকা সমস্তই ঘটে যাকাত আদায়ের কারণে। রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "ছাদ্‌কাহ্ দেয়ার কারণে সম্পদ কমেনা" মুসলিম।

আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (سبا : ٣٩)

অর্থাৎ *((তোমরা যাহাই দান করনা কেন তাকে ফেরত পাবেই, কারণ আল্লাহ্‌পাক সর্বোত্তম রিযিকদাতা))*। সূরা সাবা, আয়াত ৩৯।

৬। কিয়ামতের দিন ছাদকাহ্‌কারী তার ছাদ্‌কাহ্‌র ছায়াতে থাকবে। ঐ হাদীছে উল্লেখ হয়েছেঃ সাত ধরণের লোক আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া পাবে, যেদিন ঐ ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তাতে আছে ঃ *(এবং ঐ ব্যক্তি যিনি দান খয়রাত করেন এত গোপনে যে ডান হস্ত যা দান করে বাম হস্তও তা জানে না)*। বুখারী ও মুসলিম।

৭। উহার কারণে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. (الاعراف ١٥٦)

অর্থাৎ *((আমার রহমত সমস্ত জিনিসের উর্দ্ধে, আর আমি উহা লিখব ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যাকাত আদায় করে))*। সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৬।

যারা যাকাত দেয় না তাদের সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ . يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ . (التوبة: ٣٤-٣٥)

অর্থাৎ *((যারা সোনা, রূপাকে জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধাতুকে গরম করে উহা দ্বারা তাদের কপালে, শরীরের পার্শ্বে ও পিঠে ছেক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) ইহা হচ্ছে ঐ সম্পদ জমানোর শাস্তি যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে নিজেদের জন্য। আর ঐ জিনিস জমা রাখার শাস্তি গ্রহণ কর))।* সূরা তাওবাহ্, আয়াত ৩৪, ৩৫।

২। আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) রাসূল ﷺ হতে বলেন :

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِيْنُهُ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . (رواه مسلم، أحمد)

(সম্পদের অধিকারী কোন ব্যক্তি যদি যাকাত না দেয় তবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত জিনিসকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে পাত বানান হবে, তারপর উহা দ্বারা তার পার্শ্ব, কপাল ও অন্যান্য অঙ্গে ছেক দেয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহপাক বিচার শেষ করেন। আর ঐ দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। তারপর তার নির্দিষ্ট স্থান হবে হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম)। মুসলিম, আহ্‌মদ।

৩। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ আরো বলেন : যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক সম্পদের অধিকারী করেছেন, তিনি যদি যাকাত আদায় না করেন তবে ঐ সম্মদকে এক শক্তিশালী টাক মাথা, দুই শিং ওয়ালা রূপে উঠান হবে যা তাকে কিয়ামতের দিন আঘাত করতে থাকবে। তারপর তাকে দাঁত দিয়ে কামড়াবে ও বলবে : আমি তোমার মাল, আমি তোমার গুপ্ত সম্পদ। তারপর রাসূল ﷺ তিলাওয়াত করেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (ال عمران: ١٨٠)

অর্থাৎ *((তুমি কক্ষণই ধারণা করনা যে, যাদের আল্লাহ ভালাই দান করেছেন তারা যদি তাতে কৃপণতা করে তবে তা তাদের জন্য উত্তম। বরঞ্চ উহা তাদের জন্য নিকৃষ্ট। উহা তার ঘারে ঝুলান হবে কিয়ামতের দিন, সে যে বখিলী করেছে তার শাস্তি স্বরূপ))।* সূরা আল এমরান, আয়াত ১৮০।

৪। রাসূল ﷺ আরো বলেন : যাদেরকে উট, গরু বা ছাগলের অধিকারী করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তাদের যাকাত আদায় করেনি, তখন ঐ পশুদের কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে আরও বড় ও মোটা করে। তখন তারা তাদের মালিককে শিং দ্বারা ও পা দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন একটি ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন অন্যটি শুরু করবে। আর এটা চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচার শেষ হয়। মুসলিম।

প্রয়োজনীয় কথা

প্রথম :— উপরে উল্লেখিত আট দলের যে কোন এক দলকে যাকাত দিলেও উহা সহীহ হবে। যদিও তাদের প্রতিটি দলই পাওয়ার যোগ্য তথাপী তাদের প্রত্যেক দলকে যাকাত দেয়াটা ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় :– যে ঋণভারে জর্জরিত তাকে এমন পরিমাণে যাকাত দেয়া চলে যাতে সে পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে ঋণমুক্ত হতে পারে।

তৃতীয় :– যাকাত কোন কাফেরকে দেয়া যাবে না। সে মূলেই কাফের হউক বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হউক না কেন। তেমনি ভাবে সালাত ত্যাগকারী। কারণ তার ব্যাপারে সঠিক ফতোয়া হল সে কাফের। তবে সে যদি সালাত আদায় করতে রাজী হয় তবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

চতুর্থ :– কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। রাসূল ﷺ বলেন : *(উহাতে (যাকাতে) কোন ধনী বা কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই)।* আবুদাউদ, সহীহ সনদ।

পঞ্চম :– ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া সহীহ হবে না যাদের ভরণ পোষণের ওয়াজিব দায়িত্ব তার উপর আছে। যেমন পিতামাতা, সন্তান ও স্ত্রী।

ষষ্ঠ :– যদি স্বামী দরিদ্র হন তবে ধনী স্ত্রী তাকে যাকাত দিতে পারে। কারণ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী তাঁকে যাকাতের মাল প্রদান করেছিলেন। আর রাসূল ﷺ তা মেনে নিয়েছিলেন।

সপ্তম :– এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া উচিত নয়। অবশ্য যদি সেই রকম প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে দেয়া যেতে পারে।

যেমন : দুর্ভিক্ষ অথবা ঐ দেশে কোন দরিদ্র ব্যক্তি না মিললে অথবা মুজাহিদদের সাহায্য করার প্রয়োজন হলে। অথবা দেশের শাসক কোন জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে উহা করতে পারেন।

অষ্টম :- যদি কেউ অন্য কোন দেশে যেয়ে সম্পদের অধিকারী হয় তবে সেই দেশেই যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। তিনি উহা তার নিজের দেশে প্রেরণ করবেন যদি উপরোক্ত জরুরী কারণ সমূহের কোনটা দেখা দেয়।

নবম :- কোন ফকিরকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া জায়েয যাতে তার পুরা বৎসর বা কয়েক মাসের চাহিদা মিটে।

দশম :- সোনা ও রুপার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে সর্বাবস্থাতেই যদিও উহা টাকা হিসাবে বা অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত হউক বা অন্যকে ধার দেয়া হউক অথবা অন্য কোন অবস্থাতেই উহা থাকুক না কেন। কারণ, সাধারণভাবে যে সমস্ত দলিল প্রমাণাদি পাওয়া যায় তাতে উহাই ছাবেত করে। তবে কোন কোন আলেম বলেন, যে গহনা পরিধান করা বা ধার দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাতে যাকাত নাই। তবে প্রথম দলের কথাই অধিক কবুল যোগ্য আর তার উপর আমল করাই সঠিক হবে।

একাদশ :- ঐ সমস্ত জিনিস যা কেহ কোন নিজ প্রয়োজনের জন্য জড়ো করে তাতে যাকাত নেই। যেমন খাদ্য, পানীয়, বিছানা, বাড়ী, গবাদী পশু, পোষাক পরিচ্ছদ, গাড়ী ইত্যাদি। কারণ রাসূল ﷺ বলেন : *(মুসলিমের উপর তার দাস ও ঘোড়ার যাকাত দেয়া ওয়াজিব নয়)।* বুখারী ও মুসলিম।

আর এর ব্যতিক্রম হল শুধুমাত্র পরিধান করার সোনার ও রুপার গহনা পত্র।

দ্বাদশ :- যে সমস্ত বাড়ী-ঘর, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি ভাড়ায় খাটান হয় তাদের যাকাত হবে তাদের ভাড়ার মধ্যে যদি উহা নগদ টাকায় মিলে এবং তাতে এক বৎসর পূর্ণ হয়, যদি উহার পরিমাণ নিজে নিজে নেছাব পরিমাণ হয় অথবা ঐ টাকা অন্য টাকার সাথে মিশে নেছাব পরিমাণ হয়।

[**বি : দ্র :** যাকাতের এই অংশ কিছুটা পরিবর্তন করে শেখ আবদুল্লাহ ইবনে ছালেহ এর কিতাব হতে গ্রহণ করেছি] — লেখক

সিয়াম (রোজা) ও তার উপকারিতা

আল্লাহ্পাক বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .
(البقرة : ١٨٢)

অর্থাৎ *((হে ঈমানদারগণ ! সিয়ামকে তোমাদের উপর তেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বের যামানার লোকদের উপর করা হয়েছিল, যাতে করে তোমরা মুত্তাকী (আল্লাহ্ ভীরু) হতে পার))।* সূরা বাকারাহ্, আয়াত ১৮৩।

রাসূল ﷺ বলেন :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ (وِقَايَةٌ مِّنَ النَّارِ) (متفق عليه)

অর্থাৎ *(সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ))* অর্থাৎ জাহান্নাম হতে রক্ষাকারী। বুখারী ও মুসলিম।

১। রাসূল ﷺ আরো বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق عليه)

(যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় সিয়াম সাধন করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা দেয়া হয়)। বুখারী ও মুসলিম।

২। তিনি আরো বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ . (رواه مسلم)

(যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করে এবং সাওয়ালে আরও ছয়টা সিয়াম আদায় করে সে যেন পুরা বৎসর সিয়াম আদায় করল)। মুসলিম।

৩। তিনি আরো বলেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .(متفق عليه)

(যে ব্যক্তি রমজানে তারাবিহ্র সালাত আদায় করে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়)। বুখারী ও মুসলিম।

হে আমার মুসলিম ভাই ! জেনে রাখুন, সিয়াম একটি ইবাদত এবং এর নানা প্রকারের উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে —

(১) ছওম হজমের যন্ত্র ও পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে লিপ্ত হওয়া হতে বিরতী দান করে এবং শরীরের যে বর্জ পদার্থ আছে তাকে নিঃসরণ করে। শরীরে শক্তি যোগায় আর উহা নানা ধরণের রোগেরও নিরাময় দান করে। আর ধূমপায়ীকে ধূমপান হতে দিবসের সময়টা বিরত রাখে। এইভাবে আস্তে আস্তে তাকে উহা ত্যাগ করতে সাহায্য করে।

(২) উহা নফস বা আত্মাকে সুস্থ করে তোলে। ফলে উহা নানা ধরণের নিয়ম শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যেমন আনুগত্য, ছবর, ইখলাছ।

(৩) সাথে সাথে সিয়াম আদায়কারী নিজেকে তার অন্যান্য সিয়াম আদায়কারী ভাইদের সমকক্ষ মনে করে। কারণ তাদের সাথে একত্রেই সিয়াম শুরু করে এবং ইফ্তারও করে। ফলে সবাই ইসলামের একত্ববাদের উপর এসে যায়। সাথে সাথে সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করে তাতে তার অন্যান্য ক্ষুধার্ত ও অভাবী ভাইদের কষ্ট অনুভব করতে পারে।

রমজানে আপনার উপর জরুরী ওয়াজিব সমূহ

হে মুসলিম ভাই! জেনে রাখুন, আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করেছেন এজন্য যে, উহা আদায় করা দ্বারা আমরা তাঁর ইবাদত করব। যাতে করে আপনার সিয়াম কবুল ও উপকারী হয় তজ্জন্য নিম্নোক্ত আমল সমূহ আদায় করুন ঃ-

১। সালাতকে হেফাজত করুন। বহু সিয়াম পালনকারী আছে যারা সালাতকে অবহেলা করে। উহা হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি। উহাকে ত্যাগ করা কুফরি তুল্য।

২। আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হউন এবং কুফ্রি ও দ্বীনের প্রতি গালিগালাজ করা হতে সাবধান হোন। আর সাথে সাথে অন্যদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হতে বিরত হোন এই কথা বলে যে, আমি সিয়াম পালনকারী। এভাবেই সিয়াম নফসকে সুসামঞ্জস্য করে তুলে। আর চরিত্রের খারাপ দিকটা দূরীভূত করে। আর কুফ্রি কাজ করা হতেও বিরত রাখে যা মুসলিমদের দ্বীন হতে বের করে দেয়।

৩। সিয়াম অবস্থায় কোন আজে বাজে কথা বলবেন না, যদিও উহা হাস্যচ্ছলেই বলা হউক না কেন, কারণ উহা আপনার সিয়ামকে নষ্ট করে।

রাসূল ﷺ বলেন ঃ *(যদি কেহ সিয়াম পালনকারী হও তবে সে যেন আজে বাজে কথা বলা হতে বিরত থাক আর যেন কর্কশভাষী না হও। যদি কেহ তাকে গালি*

দেয় বা হত্যা করতে উদ্যত হয় তবে সে যেন বলে আমি সিয়াম পালনকারী, আমি সিয়াম পালনকারী)। বুখারী ও মুসলিম।

৪। সিয়ামের দ্বারা ধূমপান ত্যাগে অগ্রণী হউন। কারণ উহা ক্যান্সার, হাপানী ইত্যাদি রোগের উপাদান। নিজকে আস্তে আস্তে দৃঢ় ইচ্ছার মালিক করে তুলুন। যেমন ভাবে উহাকে দিবসে পরিহার করেছেন তেমনি ভাবে রাত্রিতেও উহা পরিত্যাগ করুন। আর এর ফলশ্রুতিতে আপনার স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই রক্ষা পাবে।

৫। আর যখন ইফতার করবেন তখন অতি ভোজন করবেন না যা সিয়ামের উপকারিতা নষ্ট করে দেয়। আর আপনার স্বাস্থ্যও এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬। সিনেমা ও টেলিভিশন দেখা হতে বিরত হউন। কারণ উহাতে চরিত্র নষ্ট হয় আর সিয়ামের উপকারিতাও নষ্ট করে।

৭। বেশী বেশী রাত্রি জাগরণ করবেন না। ফলে হয়ত সেহেবী খাওয়া ও ফজরের সালাত আদায় করা হতে বাদ পড়ে যাবেন। আর আপনার উপর জরুরী হচ্ছে সকাল সকাল সব কাজ শুরু করা। রাসূল ﷺ দু'আ করেন ঃ *(হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালের সময়ে বরকত দান করুন)।* আহমদ, তিরমিযি সহীহ।

৮। বেশী বেশী করে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও অভাবীদের দান ছদ্‌কাহ্‌ করুন। আর নিকট আত্মীয়দের বাড়ী বেড়াতে যান এবং শত্রুতা পোষণকারীদের মধ্যে মিল ঘটান।

৯। বেশী বেশী করে আল্লাহর জিক্‌র করুন, তেলাওয়াত করুন বা শ্রবণ করুন। আর উহার অর্থ অনুধাবন করতে সচেষ্ট হউন। তার উপর আমল করুন। আর মসজিদে যেয়ে উপকারী দরস সমূহ শ্রবণ করুন।

আর রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এতেকাফ করুন।

১০। সাথে সাথে সিয়ামের উপর লিখিত কিতাবসমূহ ও অন্যান্য কিতাবও পাঠ করুণ যাতে উহার হুকুম আহকাম শিক্ষা করতে পারেন। তখন শিখতে পারবেন ভূলক্রমে খানা গ্রহণ করলে বা পানীয় পান করলে সিয়াম নষ্ট হয় না। আর রাত্রে গোসল ফরজ হলে উহা সিয়ামের কোন ক্ষতি করে না। যদিও ওয়াজেব হল পবিত্রতা হাছেল করা ও সালাতের জন্য গোসল করা।

১১। রমজানে সিয়ামের হেফাজত করুন। আর আপনার সন্তানদের যখনই সামর্থ্য হবে তখন হতেই সিয়াম আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলুন। রমজানে বিনা ওযরে সিয়াম ত্যাগ করার ব্যাপারে তাদের সাবধান করুন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একদিন

সিয়াম ভঙ্গ করবে তার জন্য ওয়াজেব হল উহার কাজা আদায় করা ও তওবা করা। আর যে ব্যক্তি রমজানের দিবসে স্ত্রী সহবাস করবে সে তার কাফফারা আদায় করবে তরতীব অনুযায়ী। প্রথমে কোন ক্রীতদাস মুক্ত করা, আর যে উহা করতে সমর্থ হবে না সে যেন একাধারে ২ মাস সিয়াম আদায় করে। আর যে উহাতেও সমর্থ নয় সে যেন ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করে।

১২। হে মুসলিম ভাই! রমজানে সিয়াম ভঙ্গ করা হতে সাবধান হউন। আর কোন ওযর বশতঃ করলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবেন না। কারণ, সিয়াম ভঙ্গ করা আল্লাহর সামনে বাহাদুরী দেখানোরই সমতুল্য। আর ইসলামকে করা হয় হেয় প্রতিপন্ন। আর মানুষদের মধ্যে হয় খারাবি ছড়ান। জেনে রাখুন, যে সিয়াম আদায় করলনা তার ঈদও নাই। কারণ, সিয়াম পূর্ণ করার পর ঈদ হল আনন্দের দিবস। আর উহা এবাদত কবুলের দিবসও বটে।

সিয়ামের উপর কিছু হাদীছ

ফাজায়েলে রমজান

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

১। "যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন আসমানের দরওয়াজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরওয়াজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানদেরকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা হয়।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে: "যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরওয়াজা সমূহ খুলে দেয়া হয়।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে — "তখন রহমতের দরওয়াজাসমূহ খুলে দেয়া হয়"। বুখারী ও মুসলিম।

২। তিরমিযির রেওয়ায়েতে আছে:

وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانَ.

অর্থাৎ *"এক ঘোষক এই বলে ডাকতে থাকে, হে ভাল কার্য সম্পাদনকারীগণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো। আরও বলে, হে খারাপ কার্য আমলকারীরা পিছিয়ে যাও।*

আর আল্লাহপাক জাহান্নাম হতে বান্দাদের মুক্তি দিতে থাকেন। উহা প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না রমজান শেষ হয়।" হাসান।

৩। রাসূল ﷺ বলেন ঃ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

অর্থাৎ *(আদম সন্তানের প্রতিটি আমলকেই বর্ধিত করা হয়। প্রতিটি নেক আমলকে দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আর আল্লাহ্ আজ্জা আজল্লা বলেন ঃ "একমাত্র সিয়াম ব্যতীত। কারণ উহা একমাত্র আমার জন্য এবং উহার বদলা আমিই দেব। বান্দা তার শাহওয়াত এবং খাদ্য গ্রহণকে একমাত্র আমার জন্য ত্যাগ করে। সিয়ামকারীর জন্য দুইবার আনন্দঘন সময় আসে ঃ ইফতার করার সময় এবং তাঁর রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কসম! সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ পাকের নিকট মেশ্‌কের সুগন্ধী হতেও প্রিয়)।* বুখারী ও মুসলিম।

জিহ্বাকে সংযত রাখা

১। রাসূল ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও অন্যায় কাজ করা হতে বিরত না হয় আল্লাহর জন্য এটাও কাম্য নয় যে, সে তার খানাপিনাকে ত্যাগ করবে। বুখারী।

ইফতার, দু'আ ও সেহ্‌রী খাওয়া

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

১। *(যখন তোমরা ইফতার কর তখন খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। কারণ, উহা বরকতময়। যদি উহা না মিলে তবে পানি পান করবে। কারণ, উহা হচ্ছে পবিত্র)।* তিরমিযি, সহীহ।

২। রাসূল ﷺ ইফতারের সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

"আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফতারতু, যাহবা আজ্‌জমআ ওয়া উবতালিয়া তিল ওরুক ওয়া ছাবাতা আল আজরু ইন্‌শা আল্লাহ" অর্থাৎ *(হে আল্লাহ একমাত্র তোমার জন্য সিয়াম পালন করেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি। তৃষ্ণা দূরীভূত হয়েছে আর রগরেষা সমূহ পানি দ্বারা পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ চাহেত, ছওয়াবও নির্দিষ্ট হয়েছে)।* আবুদাউদ, হাসান।

৩। রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ *(যখন পর্যন্ত লোকেরা ওয়াক্ত হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভালাইয়ের মধ্যে থাকবে)।* বুখারী ও মুসলিম।

৪। অন্যত্র বলেন ঃ

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. (متفق عليه)

অর্থাৎ*(তোমরা সেহরী খেতে থাক। কারণ, উহাতে বরকত আছে)।* বুখারী ও মুসলিম।

রাসূল ﷺ এর ছওম

১। রাসূল ﷺ বলেন ঃ "প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং রমজান মাসে সিয়াম পালন করা সমস্ত বৎসর সিয়ামের সমতূল্য। আরাফাতের দিন (হাজী ছাড়া অন্যদের) সিয়াম পালন করলে আমি এই আশা করি যে, আল্লাহপাক তার পূর্বের বৎসরের গুনাহ আর পরের বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আশুরার (দশই মহররাম) দিনে সিয়াম পালন করলে আল্লাহ্পাক তার পূর্বের বৎসরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।" মুসলিম।

২। রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ "যদি আমি আগামী বৎসর বেঁচে থাকি তবে মহররামের নবম দিনেও সিয়াম সাধনা করব"। মুসলিম

৩। রাসূল ﷺ কে সোমবার ও বৃহস্পতিবাররের সিয়ামের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে বলেন ঃ "ঐ দুই দিন বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ্পাক রব্বুল আলামীনের সানে পেশ করা হয়। আর আমি এটা পছন্দ করি যে, সিয়ামরত অবস্থায় আমার আমল তাঁর সম্মুখে পেশ করা হবে।" নাসায়ী, হাসান।

৪। রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের ও ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম সাধনা করতে নিষেধ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম

৫। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ "রাসূল ﷺ রমজান ছাড়া অন্য কোন মাসে সমস্ত মাস ব্যাপি সিয়াম সাধনা করেননি।" বুখারী ও মুসলিম।

৬। "রাসূল ﷺ সাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এত অধিক ছওম সাধনা করতেন না।" বুখারী।

হজ্জ ও ওমরাহর ফজিলত

১। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
(ال عمران ٩٧)

অর্থাৎ *((আল্লাহ্র ঘরে যাওয়ার মত সামর্থ যাদের আছে তাদের জন্য জরুরী হল আল্লাহ্র ঘরে হজ্জ আদায় করা। আর যে তাকে (আল্লাহ্পাকের হুকুমকে) অস্বীকার করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক তাঁর বিশ্ব জগত হতে বেনিয়াজ))।* আল-এমরান, আয়াত ৯৭।

২। রাসূল ﷺ বলেনঃ

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .
(متفق عليه)

অর্থাৎ *(এক ওমরাহ হতে পরবর্তী আর এক ওমরাহ, এই দুই ওমরাহ পালন করার মধ্যবর্তী সময়ের কাফফারা (মুছে যাওয়া) স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের বদলা একমাত্র জান্নাত)।* বুখারী ও মুসলিম।

৩। রাসূল ﷺ আরো বলেনঃ

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . (متفق عليه)

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তি এমন ভাবে হজ্জ আদায় করল যাতে কোন ফাহেশা কথা বা কাজ বা ফাসেকী কোন কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমন ভাবে পবিত্র হল যেন এই মাত্রই তার মা তাকে প্রসব করল)।* বুখারী ও মুসলিম

৪। রাসূল ﷺ বলেনঃ

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ . (رواه مسلم)

অর্থাৎ *(তোমরা আমার নিকট হতে হজ্জের নিয়মাবলী শিখে লও)।* মুসলিম।

৫। হে মুসলিম ভাই ! যখনই আপনার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থ জমে যা দ্বারা মক্কা শরীফ আসা যাওয়ার ব্যবস্থা হয় তখনই সাথে সাথে ফরজ হজ্জ আদায় করুন। আর এটা জরুরী নয় যে, হজ্জের পর অন্যাদের জন্য হাদীয়া তোহ্ফা আনার মত খরচ আপনার নাই, তাই কিভাবে হজ্জ করবেন। কারণ, আল্লাহ্ এই ওযর কবুল করবেন না। তাই অসুস্থ হওয়া, দরিদ্রতা আসা বা পাপী হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পূর্বে হজ্জ করুন। কারণ, হজ্জ হচ্ছে ইসলামের রোকন সমূহের একটি রোকন।

৬। আর ওমরা ও হজ্জের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হবে তাতে ওয়াজিব হচ্ছে উহা হালাল কামাই হতে হবে যাতে করে আল্লাহপাক উহা কবুল করেন।

৭। কোন মহিলার জন্য মাহরেম পুরুষ ব্যতীত একাকী হজ্জের সফর বা যে কোন সফর করা হারাম। কারণ রাসূল ﷺ বলেন ঃ "কোন মহিলা কক্ষণই কোন মাহ্‌রেম পুরুষ ব্যতীত সফর করবে না।" বুখারী ও মুসলিম

৮। কারো সাথে কোন শত্রুতা থাকলে মিটমাট করে নিন। আর ধার দেনা থাকলে তা শোধ করুন। বিবিকে উপদেশ দিন সেজেগুজে বের না হতে, আর গাড়ী, ঈদের দিনের মিষ্টি বিতরণ, কোরবানী ইত্যাদি ব্যাপারেও উপদেশ দিন। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الاعراف: ٣١)

অর্থাৎ *((খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় কর না))।* সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩১।

৯। হজ্জ হলো মুসলিমের জন্য বিরাট এক সম্মেলন ক্ষেত্র। এতে তারা একে অন্যকে জানতে পারে, ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, আর একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারে তাদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য। আর সাথে সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের লাভের কার্য সমূহ করতে পারে।

১০। এর থেকেও বড় কথা হল, আপনি আপনার নিজের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের নিকট কায়মনো বাক্যে সাহায্য চাইতে পারেন। সকলকে ছেড়ে একমাত্র তাঁর নিকটেই দু'আ করতে পারেন। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. (الجن: ٢٠)

অর্থাৎ *((হে নবী) বলুন, আমিত একমাত্র আমার রবকে ডাকি আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না))।* সূরা জীন, আয়াত ২০।

১১। বৎসরের যে কোন সময় ওমরাহ্ করা জায়েয। তবে রমজানে করা উত্তম। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.
"রমজানে ওমরা করা হজ্জের সমতূল্য।" বুখারী ও মুসলিম।

১২। আর মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্য যে কোন মসজিদে সালাত আদায় করা হতে একলক্ষ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ রাসূল ﷺ বলেন ঃ *((আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী)* এক রাক'আত সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে হাজার রাক'আত আদায় করা হতে উত্তম। বুখারী ও মুসলিম।

অন্যত্র তিনি বলেনঃ *((মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করা আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা হতে একশত গুণ বেশী উত্তম।))* সহীহ, আহ্‌মদ। এখন, ১০০ X ১০০০ = ১,০০,০০০ বা এক লক্ষ গুণ।

১৩। আপনার জন্য উত্তম হল হজ্জে তামাত্তু করা। উহা হচ্ছে প্রথমে ওমরাহ্ করা, তারপর এহ্‌রাম হতে হালাল হয়ে তারপর হজ্জ আদায় করা। রাসূল ﷺ বলেনঃ *(হে মুহাম্মদ ﷺ এর বংশধর! তোমাদের মধ্যে যে কেহ হজ্জ আদায় করে সে যেন হজ্জের সাথে ওমরাহ্‌ও আদায় করে)।* ইবনে হিব্বান, সহীহ।

ওমরাহ্‌র 'আমলসমূহ

এহ্‌রাম, তোয়াফ, সা'য়ী, হাল্‌ক, তাহাল্লুল।

১। **আল এহ্‌রাম**ঃ- মিকাতে প্রবেশের পুর্বে এহ্‌রামের কাপড় পরিধান করুন। আর বলুন "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা বিওমরাহ" হে আল্লাহ, উপস্থিত হয়েছি ওমরাহ্ করতে।

তারপর উচ্চ স্বরে তলবীয়া "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েকা লা-শারীকালাকা লাব্বায়েক ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নে'য়ামাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা-শারীকালাক" অর্থাৎ (উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছি, এমন এক জাতের নিকট উপস্থিত হয়েছি হে আল্লাহ আপনার কোন অংশীদার নাই, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত সমস্তই আপনার নিকট হতে এবং সমস্ত রাজত্বও আপনারই। আর আপনার কোন শরীক নেই।)

২। **তওয়াফ**ঃ- যখন মক্কাশরীফ পৌছে যাবেন, তখনই হারাম শরীফ চলে যান, তারপর কা'বা ঘরের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করুন। শুরু করবেন হজরে আসওয়াদ হতে। শুরুতে বলবেনঃ বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহু আক্‌বর। যদি সমর্থ হন তবে পাথরে চুমা খান, তা না হলে ডান হাত দ্বারা ইশারাহ্ করুন। যদি সমর্থ হন তাহলে প্রতিবারই ডান হাত দ্বারা রোক্‌নে ইয়ামানীতে স্পর্শ করুন। এখানে ইশারাও করা যাবে না, চুমাও খাওয়া যাবে না। আর এই দুই রোকনের মধ্যবর্তী জায়গায় বলুন "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ্, ওয়া ফিল আখিরাতী হাসানাহ্, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার" অর্থাৎ (হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতেও ভালাই দিন এবং আখিরাতেও, আর আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন।)

তারপর তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করুন। প্রথম রাক'আতে পড়ুন সূরা কাফেরুন আর দ্বিতীয় রাক'আতে পড়ুন এখলাছ।

৩। সা'য়ী ঃ– তারপর ছফা পাহাড়ে আরোহণ করুন। তারপর কা'বার দিকে মুখ করে দুই হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে পড়ুন ঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ.

"ইন্নাছছাফা ওয়াল মারওয়া মিন শায়ায়িরুল্লাহ।"

"নিশ্চয়ই ছফা ও মারওয়া আল্লাহপাকের নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

আমি ঐটা দিয়েই শুরু করব যেভাবে আল্লাহপাক শুরু করতে বলেছেন। তারপর কোন ইশারা ব্যতীতই তিনবার "আল্লাহু আকবর" বলুন। তারপর বলুন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদ, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহ্, আন্‌জাযা ওয়া দাহ্, ওয়া ছদাকা আবদাহ্, ওয়া হাযামাল আহ্যাব অহ্দাহ" তিনবার। অর্থাৎ (আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই আর সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ন করেছেন। তাঁর বান্দাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।"

তারপর প্রতিবার ছফা ও মারওয়াতে উঠে একই নিয়ম পালন করুন। আর সাথে সাথে দু'আ করুন। ছফা ও মারওয়ার মাঝের সবুজ বাতির অংশটুকু দ্রুত অতিক্রম করুন।

ছায়ী করতে হবে সাতবার। যাওয়ায় একবার ও আসায় একবার, মোট দুইবার হিসাব করে সাতবার পূর্ণ করতে হবে।

৪। এটা শেষ হলে পূর্ণভাবে মাথা মুণ্ডণ করুন অথবা চুল খাটো করুন। মহিলারা তাদের চুলের অগ্রভাগ সামান্য কাটবে।

৫। এই ভাবেই আপনি ওমরাহ্র সমস্ত আমল শেষ করলেন এবং এহরাম অবস্থা হতে হালাল হয়ে স্বাভাবিক হলেন।

হজ্জের আমল সমূহ

এহ্রাম, মিনাতে রাত্রি যাপন, আরাফাতে অকুফ করা, মুযদালাফাতে রাত্রি যাপন করা, রমী, যবেহ্, চুল মুণ্ডন, তওয়াফ, সায়ী, হালাল হওয়া ঃ–

১। জ্বিলহজ্জের অষ্টম দিবসে মক্কাতে এহরামের কাপড় পরিধান করুন। তারপর বলুন "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা বিহাজ্জাতিহ" (হে আল্লাহ, আমি হজ্জের নিয়ত করলাম) তারপর মিনাতে গমণ করে সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করুন। ঐ স্থানে পাঁচ ওয়াক্তের

সালাত কছর করে আদায় করুন। যোহর, আছর, এশা এই তিন সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্তে কছর করে আদায় করুন।

২। তারপর জিলহজ্জের নবম দিবসে সূর্য উদয়ের পরে মিনা হতে আরাফাতে গমণ করুন। সেখানে যোহর ও আছরকে "জমা তক্দীম" করে আদায় করুন এক আযান ও দুই একামতে। তখন কোন সুন্নত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান হবেন। তা হল আরাফাতের সীমার মধ্যে থাকবেন,খাওয়া দাওয়া করবেন, তালবীয়া পাঠ করবেন আর এক আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবেন। কারণ, আরাফাতে অকুফ (অবস্থান) করা হজ্জের রোকন সমূহের মূল। আর মসজিদে নিমেরাহ এর বেশীর ভাগ আরাফাতের বাহিরে। (তাই সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আবার আরাফাত ময়দানে অকুফ করা উচিত)

৩। সূর্যাস্তের পর আরাফাত হতে বের হয়ে মুয্দালাফার দিকে রওয়ানা হউন। সেখানে মাগরেব ও এশাকে এক করে "জমা তাখির" সালাত আদায় করুন। তারপর সেখানে রাত্রি যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করুন। তারপর মাশআরুল হারামে বেশী করে আল্লাহকে স্বরণ করুন। তবে দুর্বলরা এখানে রাত্রি যাপন না করলেও তা জায়েয হবে।

৪। তারপর সূর্য উঠার পূর্বেই মুজদালাফা হতে রওয়ানা হয়ে মিনার দিকে অগ্রসর হউন। আজ ঈদের দিন। সম্ভব হলে ঈদের সালাত আদায় করুন। মিনাতে পৌঁছে বড় জুমরাতে সাতটা ছোট কংকর আল্লাহু আকবর বলে নিক্ষেপ করুন। সূর্য উঠার পর এমনকি রাত্র পর্যন্ত উহা নিক্ষেপ করা চলে।

৫। তারপর যবহ করুন এবং মিনা বা মক্কাতে ঐ গোশ্ত আহার করুন। ঈদের তিন দিন নিজেরাও আহার করুন আর ফকির, মিসকিনদের মধ্যেও গোশত বিলিয়ে দিন। যদি আপনার নিকট কোরবানী করার টাকা না থাকে তবে হজ্জের মধ্যে তিন দিন সিয়াম সাধনা করুন আর বাকী সাতদিন দেশে প্রত্যাবর্তন করে আদায় করুন। মেয়েদের জন্যও একই মাসআলা। তার উপরও যবেহ করা ওয়াজেব, অসমর্থ হলে সিয়াম পালন করবেন। এই নিয়ম হজ্জে তামাত্ত এর বেলায় প্রযোজ্য।

৬। তারপর আপনার মস্তককে পূর্ণভাবে মুণ্ডিত করুন বা সমগ্র মাথার চুল খাটো করুন। তবে মুণ্ডণ করা উত্তম। তারপর আপনার পোষাক পরিধান করুন। এখন আপনার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সমস্ত কিছুই হালাল হল।

৭। তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করুন। ইহাকে ঈদের শেষ দিন পর্যন্ত দেরী করে আদায় করাও চলে। এরপর আপনার বিবির সাথে মেলা আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

৮। তারপর ঈদের কয়েক দিনের জন্য মিনাতে প্রত্যাবর্তন করুন। ওয়াজেব হিসাবে ওখানে রাত্রি অতিবাহিত করুন। প্রত্যহ যোহরের পর তিনটা জমারাতে (শয়তান) কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। শুরু করবেন ছোটটা হতে। ইহা রাত্রি পর্যন্ত করা চলে। প্রতিটিতে ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। প্রতিবার পাথর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবর বলুন। খেয়াল রাখতে হবে কঙ্কর গুলো যেন জুমারাতে লাগে, যেগুলো লাগবে না তা পুনর্বার নিক্ষেপ করুন। সুন্নত হচ্ছে, ছোট ও মাঝারী শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। পাথর নিক্ষেপে অসমর্থ হলে মেয়েদের, রোগীদের, ছোটদের ও দুর্বলদের পক্ষ হতে অন্যেরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। যদি কোন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনেও উহা নিক্ষেপ করা যাবে।

৯। বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজেব। এই তওয়াফ করার সাথে সাথে সফর শুরু করতে হবে।

হজ্জ ও ওমরাহ্‌র আদবসমূহ

১। এখলাছের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হজ্জ আদায় করুন। মনে মনে বলুনঃ হে আল্লাহ্‌! এই হজ্জ কোন লোক দেখানো আমল বা নামের জন্য নয়।

২। নেককার লোকদের সাথে সফর করুন এবং তাদের খেদমত করতে সচেষ্ট হউন। আর আপনার প্রতিবেশীর দেয়া কষ্ট সহ্য করতে সচেষ্ট হউন।

৩। ধূমপান ত্যাগ ও সিগারেট ক্রয় করা হতে সাবধান হউন। কারণ উহা হারাম। শরীরকে, পার্শ্ববর্তীজনকে এবং মালকেও উহা ক্ষতি করে। আর উহা আল্লাহ পাকের স্পষ্ট নাফরমানী।

৪। প্রতিটি ছালাতের সময় মেসওয়াক করতে তৎপর হউন। সেখান থেকে যমযমের পানি ও খেজুর হাদিয়া হিসাবে বহন করুন। কারণ, ছহীহ্‌ হাদীছে এগুলোর ফজিলত সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

৫। মেয়েমানুষ স্পর্শ করা হতে সাবধান হউন। তাদের প্রতি অহেতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর আপনার সাথী মেয়েদের সর্বদা পর্দার মধ্যে রাখতে সচেষ্ট হউন।

৬। কখনও মুছল্লিদের কাধ ডিঙ্গিয়ে, তাদের কষ্ট দিয়ে চলাফেরা করবেন না। বরঞ্চ যেখানে স্থান পান সেখানেই বসতে সচেষ্ট হউন।

৭। দুই হারামেও ছালাতরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করবেন না। কারণ উহা শয়তানের কার্য।

৮। ছালাত আদায়ে ধীর স্থিরতা প্রদর্শন করুন। কোন সুতরা যেমন দেওয়াল, কারো পিছনে ছালাত আদায় করুন। ইমামের সুতরাই পিছনের ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট।

৯। তওয়াফ, সায়ী, পাথর নিক্ষেপ, হজরে আসওয়াদে চুমা খাওয়া ইত্যাদি কার্যের সময় আপনার আশেপাশের লোকদের প্রতি খেয়াল করবেন যাতে তারা কোন কষ্ট না পায়। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য।

১০। গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করা হতে সাবধান থাকবেন। কারণ, উহা ঐ শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যাতে হজ্জ ও তার সমস্ত আমলই বাতেল হয়ে যায়।

কারণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . (الزمر ٦٥)

অর্থাৎ *((যদি তুমি শির্ক কর তবে তোমার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে))।* সূরা যুমার, আয়াত ৬৫।

মসজিদে নববীর কিছু আদব কায়দা

১। যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন ডান পা প্রথমে এগিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন এবং বলুন ঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

বিসমিল্লাহ ওয়াছ্ছালাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা আফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা" অর্থাৎ *(আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, তাঁর রাসূলের উপর ছালাত ও সালাম। হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহ্মতের দ্বারসমূহ খুলে দিন।)*

২। তারপর দুই রাক'আত তাহ্ইয়াতুল মসজিদের ছালাত আদায় করুন। তারপর রাসূল ﷺ-এর উপর এই বলে সালাম পেশ করুন — "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আস্সলামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্রীন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া ওমারা (রাঃ)"। তারপর কেবলার দিকে মুখ করে দু'আ করুন। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ "যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহ্র নিকট চাও, যদি কোন সাহায্য চাও তবে একমাত্র তাঁর নিকটেই সাহায্য চাও" তিরমিযি, হাসান,

৩। মসজিদে রাসূল ﷺ-এর জেয়ারত এবং তাঁর উপর সালাম দেয়া মুস্তাহাব। এর সাথে হজ্জ ছহীহ হওয়া বা না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়ও ঠিক করা নেই।

৪। জেয়ারতের সময় রওজা শরীফের জানালা বা দেওয়াল স্পর্শ করা বা চুমা খাওয়া হতে নিজকে বাঁচান। কারণ, উহা হচ্ছে বেদআত।

৫। যখন মসজিদ হতে বের হন তখন কবরকে সামনে রেখে এবং কবরের দিকে মুখ করে পিছিয়ে আসা বেদআত। এর পক্ষে কোন দলিল নেই।

৬। রাসূল ﷺ-এর উপর বেশী বেশী দরুদ পাঠ করুন। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا . (رواه مسلم)

অর্থাৎ *(যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করবেন)।* মুসলিম।

৭। জান্নাতে বাকী কবরস্থান এবং অহুদের শহীদদের কবর যেয়ারত করাও মুস্তাহাব। তবে সাত মসজিদের ব্যাপারে কোন দলিল নেই।

৮। মদীনা শরীফ সফর করার সময় নিয়ত হবে মসজিদে নবী ﷺ যেয়ারত করা। তারপর ওখানে পৌঁছলে পরে রাসূল ﷺ-এর উপর সালাম করার নিয়ত করতে হবে। কারণ, তাঁর মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে ছালাত আদায় করা হতে হাজার গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। আর রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ *(তিনটি মসজিদ ব্যতিত অন্যত্র কষ্ট করে ছওয়াবের আশায় যেয়ারতে যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা, আর আমার এই মসজিদ)।* বুখারী ও মুসলিম

মুজতাহিদগণের হাদীছ অনুযায়ী চলার ঘটনা

চার ইমাম (রঃ) গণকে আমাদের তরফ হতে আল্লাহপাক উত্তম বদলা দান করুণ। তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিকট যে হাদীছসমূহ পৌঁছেছিল তার উপর ইজতেহাদ করে ছিলেন। তাদের একে অপরের সাথে যে মত পার্থক্য ঘটেছিল তার বিশেষ কারণ হচ্ছে, কারো নিকট কোন হাদীছ পৌঁছে ছিল যা কিনা অন্যের নিকট পৌঁছে নাই। কারণ, সেই যামানায় হাদীছের খুব বেশী প্রসার ঘটেনি। আর হাদীছের হাফেজগণ নানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। কেহ ছিলেন হেজাযে, কেহ শামে, কেহ এরাকে, কেহ মিসরে অথবা ইসলামী অন্যান্য দেশে। তাদের যামানায় এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত ছিল খুবই কঠিন ও কষ্টবহুল। সে কারণে দেখতে পাই, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) যখন ইরাক ছেড়ে মিসরে গেলেন তখন ইরাকে তার যে পুরাতন মাযহাব ছিল তা ত্যাগ করেন। কারণ, তখন তাঁর সম্মুখে নুতন নুতন বহু সহী হাদীছ উপস্থাপিত হয়।

তাই দেখতে পাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাব হচ্ছে কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু ছুটে যায়। কিন্তু অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফাহ্ (রহঃ)-এর মতে ছুটে না। এমত অবস্থায় আমাদের উপর ওয়াজিব হল কুরআন ও ছহীহ্ সুন্নতকে তালাশ করা। আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۔ (النساء ٥٩)

অর্থাৎ *((যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তার বিচারের ভার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক। উহাই হচ্ছে উত্তম এবং সঠিক ব্যাখ্যা))।* সূরা নিসা, আয়াত ৫৯।

কারণ সত্য কখনও একাধিক হতে পারে না। তাই মহিলার শরীর স্পর্শে ওযু টুটবে অথবা টুটবে না। আর আমাদেরকেতো হুকুম করাই হয়েছে আল্লাহ্পাকের নিকট হতে যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। আর রাসূল ﷺ আমাদেরকে ছহীহ্ হাদীছের মাধ্যমে উহার ব্যাখ্যা দান করেছেন। কারণ আল্লাহ্ পাক বলেন :

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (الأعراف :٣)

অর্থাৎ *((তোমাদের রবের তরফ হতে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ কর। তাকে ছেড়ে অন্য কোন আউলিয়াদের অনুসরণ কর না। তোমরা খুব কমই ইহা স্মরণ কর))।* সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩।

তাই কোন মুসলিমের সামনে কোন ছহীহ্ হাদীছ পেশ করলে তাকে এই বলে ত্যাগ করা জায়েয নয় যে, উহা আমাদের মায্হাব বিরোধী। কারণ সমস্ত ইমাম গণের এজমা হচ্ছে সর্বদা ছহীহ হাদীছ গ্রহণ করা, আর উহাদের খেলাফ তাদের যে মতবাদ তা পরিহার করা।

হাদীছ সম্বন্ধে ইমামগণের মতামত

নিম্নে ইমাম (রহঃ)গণের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। তাদের উল্লেখিত বক্তব্যের মাধ্যমে, তাদের উপর যেসব দোষারোপ করা হয়, তা দূরীভূত হবে এবং তাদের অনুসারীদের নিকট সত্য উদঘাটিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) (প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর ফেকাহ্‌র নিকট ঋণী) বলেন ঃ

১। কোন ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না আমাদের কোন কথাকে গ্রহণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞাত হবে উহা আমরা কোথা হতে গ্রহণ করেছি।

২। ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম, যে আমার দলীল না জেনে, শুধু কথার উপর ফতোয়া দেয়। কারণ আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি আগামীকাল আবার উহা হতে প্রত্যাবর্তন করি।

৩। যদি আমি এমন কোন কথা বলি, যা আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূলের কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তখন আমার কথাকে ত্যাগ করবে।

৪। ইমাম ইবনে আবেদীন তার কিতাবে বলেন ঃ যদি কোন হাদীছ ছহীহ হয় আর উহা মায্‌হাবের বিরোধী হয় তথাপি ঐ হাদিছের উপর আমল করতে হবে। উহাই হবে তার জন্য মায্‌হাব। কোন মোকাল্লেদ উহার উপর আমলের দ্বারা হানাফী মাযহাব হতে বের হয়ে যাবেন না। কারণ ছহীহ রেওয়ায়েতে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যদি হাদীছ ছহীহ হয় তবে উহাই আমার মায্‌হাব।

ইমাম মালেক (রঃ), যিনি মদীনা মনোওয়ারার ইমাম বলে খ্যাত ছিলেন, তিনি বলেন ঃ

১। আমিতো একজন মানুষ মাত্র। ভুলও করি, শুদ্ধও করি। তাই আমার রায়কে উত্তমভাবে পর্যবেক্ষণ কর। তার মধ্যে যেগুলো কুরআন-হাদীছের সাথে মিলে তাদের গ্রহণ কর। আর যেগুলো কুরআন ও হাদীছের সাথে মিলে না তাকে ত্যাগ কর।

২। রাসূল ﷺ -এর পরে এমন কোন ব্যক্তি ব্যক্তি নেই যার কিছু কথা গ্রহণ করাও চলে, আর কিছু ত্যাগ করাও চলে। শুধুমাত্র নবী ﷺ -এর সব কথা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ), যিনি আহ্‌লে বাইতের (নবীর বংশধর) একজন, তিনি বলেন ঃ

১। এমন কেহ নেই যার নিকট রাসূল ﷺ -এর কিছু সুন্নত আছে আর কিছু গায়েব আছে। তাই আমি যত কথাই বলিনা কেন, আর যত উছূলী কথাই বলি না কেন, যদি রাসূল ﷺ হতে তার বিপরীত কোন কথা আমার দ্বারা বলা হয়ে থাকে তবে রাসূল ﷺ -এর কথাই গ্রহণযোগ্য, আর উহাই আমার কওল।

২। মুসলিমদের এজমা হচ্ছে, যদি কারও নিকট রাসূল -এর কোন সুন্নত প্রকাশিত হয় তবে তাঁর কথাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কথা গ্রহণ করা তার জন্য যায়েজ হবে না।

৩। যদি আমার কোন কিতাবে রাসূল -এর সুন্নতের পরিপন্থি কোন কথা দেখতে পাও তবে তোমরা রাসূল -এর কথাকেই গ্রহণ করবে। উহাই আমার কথা।

৪। যদি কোন হাদীছ ছ্বীহ হয় তবে উহাই আমার মাযহাব।

৫। একদা ইমাম আহ্‌মেদ ইবনে হাম্বল (রঃ)কে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা আমার থেকে হাদীছ ও তার বর্ণনাকারীদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত আছ। যদি কোন ছ্বীহ হাদীছ পাও তবে সাথে সাথে আমাকে জ্ঞাত করবে যাতে আমি তার উপর মায্‌হাব বানাতে পারি।

৬। ঐ সমস্ত মাসআলা যাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমি যা বলেছি তা ছ্বীহ হাদীছের বিপরীত তবে আমি আমার জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যর পরও উহা হতে বিরত হচ্ছি।

ইমাম আহ্‌মদ ইব্‌নে হাম্বল (রঃ), যাকে ইমামু আহলে সুন্নত বলা হয়, তিনি বলেন ঃ

১। আমাকে তক্‌লীদ (অন্ধ অনুসরণ) কর না, আর না মালেকরা বা শাফেয়ী (রঃ) বা আওযায়ী (রঃ) অথবা ছওরী (রঃ) কে অনুসরণ কর, বরঞ্চ তারা যেখান হতে গ্রহণ করেছে সেখান হতে গ্রহণ কর। (যারা বুঝেছে ও শিখেছে তাদের হতে)

২। যে ব্যক্তি রাসূল -এর কোন হাদীছকে অস্বীকার করবে সেতো ধংসের মুখামুখি এসে দাড়িয়েছে।

ক্বদরের ভাল ও মন্দের উপর ঈমান আনা

ইহা হচ্ছে ঈমানের ভিত্তি সমূহের ষষ্ঠ ভিত্তি। এর অর্থ সম্বন্ধে ইমাম নওভী (রঃ) তার আরবাইন হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক প্রতিটি জিনিসের ভাগ্য অতীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর ঐ সমস্ত জিনিসগুলোর জন্য যা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা কখন, কিভাবে ঘটবে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবগত আছেন। কোন্ স্থানে ঘটবে তাও তিনি অবগত আছেন। আর অবশ্যই উহা ঘটবে ঐ ভাবেই যেভাবে তাঁর নিকট উহা লিপিবদ্ধ আছে।

কদর বা ভাগ্যের উপর কয়েক ধরনের ঈমান আনতে হবে —

১। **জ্ঞানের ক্ষেত্রে কদর (নির্দিষ্টকরণ) :** উহা হচ্ছে ঐ ঈমান পোষণ করা যে, আল্লাহপাক পূর্ব হতেই জ্ঞাত আছেন বান্দারা ভাল ও মন্দ কার্য কখন, কিভাবে করবে। তাদের সৃষ্টি ও দুনিয়াতে পয়দা করার পূর্বেই তিনি জ্ঞাত আছেন তারা কি তার আনুগত্য করবে নাকি বিরোধিতা করবে। আর তাদের মধ্যে কারা জান্নাতী হবেন আর কারা জাহান্নামী হবে। আর তাদের সৃষ্টি ও গঠনের পূর্বেই তিনি তাদের জন্য উত্তম বদলা বা শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাদেব ভাল বা মন্দ আমলের জন্য। এর প্রতিটি জিনিসই উত্তমভাবে লিপিবদ্ধ করে তাঁর নিকটে রেখেছেন। আর বান্দার প্রতিটি কার্যই ঐ ভাবে ঘটতে থাকে যেভাবে উহা তাঁর এলেমের মধ্যে ও কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

[এই অংশটুকু ইবনে রজব হাম্বলী (রঃ)-এর জামেয়ুল উলুম ওয়াল হেকাম কিতাব হতে নেয়া হয়েছে]

২। **লওহে মাহফুজে যে তকদীর লিপিবদ্ধ আছে :** ইবনে কাসির (রঃ) তাঁর তফসীরে, আব্দুর রহমান ইবনে সালমান (রঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন : আল্লাহপাক যা কিছুই নির্দিষ্ট করেছেন, কুরআন পাক বা তার পূর্বের বা পরের ঘটনা সমস্ত কিছুই লওহে মাহ্ফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন অর্থাৎ উহা "মালাউল আ'লাতে" আছে। তফসীরে ইবনে কাসীর চতুর্থ পৃঃ ৪৯৭।

৩। **মায়ের গর্ভের ভাগ্য লেখা :** হাদীছে বর্ণিত আছে *(...তারপর মায়ের গর্ভের এই নবজাতকের নিকট আল্লাহপাক এক ফেরেশ্তা (মালাইকা) পাঠান, যিনি তার মধ্যে আত্মা ফুকিয়ে দেন এবং তাকে চারটা কথা লিখতে বলেন, যথা : তার রিযিক, আয়ু, আমল, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন)।* বুখারী ও মুসলিম।

৪। **সময় নির্দিষ্ট করার তকদীর :** উহা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে ভাগ্য লিপিবদ্ধকরণ। আল্লাহপাক ভাল ও মন্দকে সৃষ্টি করেছেন। আর উহা কখন কিভাবে বান্দার নিকট উপস্থিত হবে তারও নির্দিষ্ট সময় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। শরহে আরবাইণ।

কদরের উপর ঈমান আনার লাভসমূহ

১। আল্লাহর উপর রাজী খুশী থাকা, একিন, আর উত্তম বদলা। আল্লাহ্পাক বলেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. (التغابن، ١١)

অর্থাৎ *((যে সমস্ত বিপদ আপদই (তোমাদের) স্পর্শ করুক না কেন উহা আল্লাহ্র অনুমতি নিয়েই আসে))।* সূরা তাগাবুন, আয়াত ১১ ।

এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুমেই ঘটে অর্থাৎ তাঁর দেয়া তক্বদির ও বিচারের মাধ্যমেই এটা ঘটে ।

অন্যত্র আল্লাহ্পাক বলেন :

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. (التغابن، ١١)

অর্থাৎ *((আর যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে আল্লাহ্পাক তার অন্তরে হেদায়েত দিয়ে দিবেন))।* সূরা তাগাবুন, আয়াত ১১। ইবনে কাছীর (রঃ) তাঁর তফসীরে বলেন : আর যাকে কোন মুছিবতে পাকড়াও করে তার অবশ্যই বুঝা উচিত যে, এটা আল্লাহ্র বিচারে হয়েছে এবং উহা তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফলে সে ধৈর্য্য ধারণ করে সওয়াবের আশায়। আর তারপর যখন আল্লাহর বিচারকে মেনে নেয় তখন আল্লাহ্পাক তার অন্তরকে হেদায়েত দান করেন। আর এজন্য দুনিয়াতে তার যে ক্ষতি হয় তার বদলে তার অন্তরে হেদায়েত, সত্যিকারের একিন দান করেন। আর তার নিকট হতে যা ছিনিয়ে নেয়া হয় তা অথবা তার থেকে উত্তম জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : তার অন্তরে এমন হেদায়েত দেন যাতে একিন এসে যায়। তখন সে বুঝতে পারে, তাকে যে বিপদ স্পর্শ করেছে তা ভুল ক্রমে নয়। আর সে যে ভুল করেছে তা শুদ্ধ করার ক্ষমতা তার ছিল না। আলকামাহ (রঃ) বলেন : সেই ব্যক্তিকে যখন কোন মুছিবত স্পর্শ করে তখন সে বুঝতে পারে, উহা আল্লাহ্র নিকট হতেই এসেছে।

২। গুণাহ্ মাফ হওয়া : রাসূল ﷺ বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهِمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ *(কোন মোমেন বান্দা যত রকমের মুছিবত, কষ্ট, অসুস্থতা, পেরেশানী, এমনকি যে দুঃশ্চিন্তা করে তার দ্বারা আল্লাহপাক তার পাপসমূহ দূরীভূত করেন)।* বুখারী ও মুসলিম।

৩। উত্তম বদলা দানঃ আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ. (البقرة ١٥٥)

অর্থাৎ *((আর ঐ সমস্ত ছবরকারীদের সুসংবাদ দান করুণ যখন তাদের কোন মুছিবত স্পর্শ করে তখন তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্ হতে আর নিশ্চয়ই তার নিকটেই প্রত্যাবর্তন করব। তাদের উপর তাদের রবের নিকট হতে মাগফিরাত ও রহমত বর্ষিত হবে। আর তারাই হচ্ছে হেদায়েত প্রাপ্ত))*। সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৫৫।

৪। অন্তর ধনী হওয়াঃ রাসূল ﷺ বলেনঃ *"আল্লাহ্‌পাক তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন যদি তাতে খুশী থাক তবে তুমি সর্বোচ্চ ধনী হয়ে যাবে।"* আহমদ, তিরমিযি, হাসান।

অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেনঃ *(শুধুমাত্র সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকলেই সে ধনী হয় না, বরঞ্চ ধনী সেই ব্যক্তি যার অন্তর ধনী)*। বুখারী ও মুসলিম।

এটা লক্ষ্য করা যায় যে, যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী তারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। ফলে তারা অন্তরের দিক দিয়ে দরিদ্র। আর যে ব্যক্তি সামান্য বিত্ত সম্পদের মালিক, কিন্তু তার যথাসাধ্য চেষ্টার পর, আল্লাহপাক তার জন্য যা নির্দিষ্ট করেছেন তাতে সে খুশী থাকে তখনই তিনি অন্তরের ধনী হয়ে উঠেন।

৫। অতিরিক্ত খুশীও হয় না, আর দুঃখিতও হয় নাঃ আল্লাহ্‌পাক বলেনঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا. إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. (الحديد : ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ *((যে কোন মুছিবতই যা দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয় বা তোমাদের স্পর্শ করে তা পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ আছে তাদের সৃষ্টির পূর্বেই। আর উহা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ। আর এটা এজন্য বলা হলো যাতে তোমাদের যা নাগালে আসে না তাতে দুঃখিত না হও, আর যা প্রাপ্তি ঘটে তাতে অতিরিক্ত খুশী না হও। কারণ আল্লাহ্‌পাক কোন অহংকারী লোককে পছন্দ করেন না))*। সূরা হাদীদ, আয়াত ২২-২৩।

ইবনে কাছির (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ্‌পাক তোমাদের যে নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য লোকদের সম্মুখে নিজের অহংকার প্রকাশ করবে না। কারণ, উহা তোমাদের

প্রচেষ্টার কারণে নয়। বরং উহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তিনিই রিযিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতসমূহকে তোমাদের অহংকার প্রকাশের রাস্তা বানাবে না। একরামাহ (রঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তিরই অতিরিক্ত খুশী বা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ, যখন খুশীর কোন ঘটনা ঘটে তখন শুকরিয়া আদায় করবে, আর যখন দুঃখের কোন ঘটনা ঘটবে তখন ছবর করবে। তফসীরে ইবনে কাছির, চতুর্থ খণ্ড।

৬। নির্ভীকতা ও সাহসীকতা ঃ যে ব্যক্তি কদরের উপর বিশ্বাস করেন তিনি অবশ্যই সাহসী হবেন। আর আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পাবেন না। কারণ তিনি জানেন, মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর তিনি যা ভুল করবেন তা কক্ষণই শুদ্ধ হওয়ার নয়। আর তাকে যে বিপদ স্পর্শ করে তা ভুল করে নয়। আর ছবরকারীদের জন্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আর দুঃখ কষ্টের পর প্রশান্তি আসবে। আর বিপদের পরই সুখ।

৭। মানুষ কর্তৃক ক্ষতি হওয়া হতে নির্ভীক হওয়া ঃ রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » (رواه الترمذي)

অর্থাৎ *(জেনে রাখ, যদি সমস্ত মানুষ মিলেও তোমার কোন ভাল করতে চায় তবে তা কক্ষনই সম্ভবপর হবে না, যদি না আল্লাহ পাক তা তোমার ভাগ্যে লিখে রাখেন। আবার তারা যদি সকলে মিলেও তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় আর আল্লাহপাক যদি ঐ ক্ষতি করার কথা না লিখে রাখেন তবে কেহই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গেছে)*। তিরমিযি, হাসান ছহীহ

৮। মৃত্যু হতে নির্ভীক হওয়া ঃ

আলী (রাঃ) এক কবিতার মাধ্যমে বলেন ঃ

আমি কোন্ দিন মৃত্যুর হাত হতে পালায়ন করব, যেদিন আমার ভাগ্যে মওত লেখা আছে, না, যেদিন লেখা নেই ? সেদিনত ভয়ই পাবনা। আর যেদিন লেখা আছে, ঐদিন তো বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

৯। যা কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তাতে অনর্থক অনুশোচনা না আসা ঃ রাসূল ﷺ বলেন ঃ শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হতে আল্লাহ পাকের নিকট উত্তম ও অধিক ভালবাসার পাত্র। তবে তাদের উভয়ের মধ্যেই খায়ের রয়েছে। তাই সর্বদা ঐ কার্যে সচেষ্ট হউন যা আপনার উপকার দিবে। আর সর্বদা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করুন, কক্ষনও অপারগ হবেন না। যদি আপনাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তবে এই বলবেন না যে, যদি আমি এইভাবে ঐভাবে করতাম তবে উহার ফল এই রকম ঐ রকম হত। বরঞ্চ বলুন ঃ আল্লহ্‌পাক যা তক্দীরে রেখেছিলেন ও ইচ্ছা করেছিলেন তাই ঘটেছে। কারণ, "যদি" বলাটা শয়তানের রাস্তা খুলে দেয়। বুখারী ও মুসলিম।

১০। আর আল্লাহপাক যা নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্যেই ভালাই রয়েছে ঃ ধরুণ, কোন মুসলিমের হাত কিছুটা কেটেছে। সে এই বলে আল্লাহর প্রশংসা করবে যে, হাতটা ভাঙ্গেনি। আর যদি ভাঙ্গে তবে এই বলে শোকরিয়া আদায় করবে যে, উহা কাটা পড়েনি। অথবা তার পিঠ যে ভাঙ্গেনি তাতে শুকরিয়া আদায় করবে। কারণ, তা আরও ভয়ঙ্কর। একবারের ঘটনা ঃ এক ব্যবসায়ী একদা কোন ব্যবসায়ীক কারণে বিমানে আরোহণের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় মুয়াযি্যন আযান দেন ছালাতের জন্য। ফলে তিনি জামাতে ছালাত আদায় করতে চলে যান। যখন ছালাত শেষ হল তখন জানতে পারলেন যে, বিমান চলে গেছে। ফলে খুব পেরেশান হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর খবর আসলো যে, প্লেনটি আকাশে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তৎক্ষনাৎ তিনি সিজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন নিজে বেঁচে যাওয়ার কারণে ও ছালাতের কারণে দেরী হওয়াতে। তাই আল্লাহ্‌র ঐ কথা স্মরণ করুন ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ . (البقرة : ٢١٦)

অর্থাৎ *((আর তোমরা হয়ত কোন জিনিসকে অপছন্দ কর কিন্তু উহা তোমাদের জন্য উত্তম। আর হয়ত কোন জিনিসকে পছন্দ কর যা কিনা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞাত আর তোমরা কিছুই জ্ঞাত নও))।* সূরা বাকারাহ, আয়াত ২১৬।

কদর নিয়ে তর্ক করতে নেই

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব হল, সে এই আকিদা পোষণ করবে যে, ভাল ও মন্দ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আর উহা তাঁর এলেমে ও ইচ্ছাতে আছে। কিন্তু ভাল ও মন্দ করার সামর্থ বান্দার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। আর তার উপর ওয়াজেব হল আদেশ ও নিষেধ পালনে তৎপর হওয়া। তার জন্য এটা জায়েয হবে না কোন পাপ কর্ম করে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ আমার জন্য এই পাপকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাই করেছি। নাউযুবিল্লাহ !

আল্লাহ্‌পাক রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের উপর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন যাতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সুখের রাস্তা ও দুঃখ কষ্টের রাস্তা। আর মানুষকে সম্মানীত করেছেন বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দ্বারা। আর সাথে সাথে তাকে গোমরাহী ও হেদায়েতের রাস্তা শিখিয়েছেন।

আল্লাহ্‌পাক বলেন:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ (الانسان: ٣)

অর্থাৎ *((নিশ্চয়ই আমি তাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছি। এরপর হয় সে শুকুর গুজার বান্দা হবে, না হয় কুফরির রাস্তা এখতিয়ার করবে))*। সূরা ইনসান, আয়াত ৩। মানুষ যদি ছালাত ত্যাগ করে বা মদ্যপান করে তবে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে আল্লাহ্‌র হুকুম ও নিষেধ অমান্যের কারণে। তখন তার উপর কর্তব্য হল তওবা করা এবং আফশোস করা। তখন কদরে লেখা আছে বলে রেহাই পেতে পারে না।

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গকারী কারণসমূহ

নিশ্চয়ই ঈমান ভঙ্গকারী কারণ রয়েছে, যেমন অজু ভঙ্গের কারণসমূহ আছে। যদি কোন ওযুকারী ওযু ভঙ্গের কোন একটা আমলও করেন তবে তার ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন তার উপরে ওয়াজেব হল তিনি উহাকে নূতন করে করবেন, সেই রকম ঈমানের ক্ষেত্রেও।

ঈমান নষ্টকারী কারণসমূহ চার ভাগে বিভক্ত:

প্রথম ভাগ: এতে সামিল আছে আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা তাতে কোন শক সন্দেহ্ করা।

দ্বিতীয় ভাগ: আল্লাহ্‌পাক যে সত্যিকার মা'বুদ তা অস্বীকার করা অথবা তাঁর সাথে কোন শির্‌ক করা।

তৃতীয় ভাগ: আল্লাহ্‌পাকের সুন্দর সুন্দর নামসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাঁর ছিফতসমূহ অস্বীকার করা অথবা তাতে কোন শক সন্দেহ প্রকাশ করা।

চতুর্থ ভাগ: রাসুল (ﷺ)-এর রেসালাতকে অস্বীকার করা অথবা তাঁর রেসালাতের ব্যাপারে শক সন্দেহ পোষণ করা।

প্রথম ভাগ
আল্লাহ্‌র অস্তীত্ব অস্বীকার করা

এর কয়েকটা ক্ষুদ্র ভাগ– প্রকার রয়েছে।

১। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। যেমন নাস্তিকেরা করে থাকে এই বলে যে, স্রষ্টা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। আর তারা বলেঃ কোন উপাস্য নেই বরঞ্চ জীবন হচ্ছে পদার্থ হতে। তারা প্রমাণ দেখায় যে, সৃষ্টি হওয়া আর এই সমস্ত কাজকর্ম হঠাৎ হয়ে যায় এবং প্রাকৃতিক কারণেই এগুলো ঘটে থাকে। তারা প্রাকৃতি ও হঠাৎ হওয়ার যিনি মালিক তার কথা ভুলে গেছে। কারণ আল্লাহপাক বলেনঃ *((আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা, আর তিনি এই সমস্ত জিনিসের অভিভাবক ও দেখা শুনাকারী))।* সূরা যুমার, আয়াত ৬২।

এই দল ইসলামের পূর্বের যামানার কাফেরদের হতেও কট্টর কাফের, এমনকি শয়তান হতেও। কারণ, তারা উভয়েই তাদের স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করত। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক কুরআনে বলেনঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ . (الزخرف ٨٧)

অর্থাৎ *((যদি তাদের প্রশ্ন কর কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্))।* সূরা যুখরুফ, আয়াত ৮৭। শয়তান সম্বন্ধে কুরআন বলেঃ

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ . (ص : ٧٦)

অর্থাৎ *((সে বলল আমি তাঁর (আদম) চেয়ে উত্তম, আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন))।* সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৭৬।

তাই এই জাতীয় কুফরির মধ্যে পড়বে যদি কোন মুসলিম বলে যে, ইহাকে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে অথবা বলে ইহার অস্তিত্ব নিজ থেকেই হয়েছে, যেমনভাবে নাস্তিক বা অন্যরা বলে থাকে।

২। যদি কেহ নিজকে ফের আউনের মত রব দাবী করে। যেমন সে বলেছিলঃ

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (النازعات : ٢٤)

অর্থাৎ *((আমিই সর্বোচ্চি রব))।* সূরা নাযিয়াত, আয়াত ২৪।

৩। এই দাবী করা যে, দুনিয়াতে অলীদের মধ্যে কিছু কুতুব আছেন যারা দুনিয়ার কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তারা আল্লাহ্‌পাক রব্বুল ইজ্জতের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

তারা এই আকীদার ক্ষেত্রে ইসলামের পূর্বের কাফেরদের হতেও অধম। কারণ, তারা (কাফিররা) সর্বদাই স্বীকার করত যে, দুনিয়ার সমস্ত কর্ম পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ্‌পাক তাদের সম্বন্ধে বলেন :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ؟ فَسَيَقُولُونَ اللهُ . فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ . (يونس ، ٢١)

অর্থাৎ *((হে নবী ! তাদের প্রশ্ন করুন, কে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করেন দুনিয়া ও আসমান হতে ? আর কে শ্রবণের ও দর্শনের ক্ষমতার মালিক ? আর কেইবা জীবিতকে মৃত হতে বের করেন ? আর মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করেন ? আর কেইবা সমস্ত কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন ? তারা সাথে সাথে উত্তর দিবে : আল্লাহ্। হে নবী ! আপনি তাদের বলুন : তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করবেনা?))* সূরা ইউনুস, আয়াত ২১।

৪। কিছু কিছু সুফী পীরেরা বলে : আল্লাহ্‌পাক কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে আছেন। যেমন, ইবনে আরাবী বলে এক সুফী, যাকে দামেস্কে কবর দেয়া হয়েছে, সে বলত :

রবও বান্দা, আর বান্দাও রব।
হায় আমার বুঝে আসে না! কে কাকে ইবাদত করবে ?

চরমপন্থী সুফীরা আরো বলে :

কুকুর আর শুকর তারাতো আমাদের মা'বুদ ছাড়া কেউ না, আর আল্লাহ্ তো গীর্জাতে উপাসনা রত জাযক ব্যতীত কেহ নহে।

হাল্লাজ বলত : আমিই সে (আল্লাহ্) আর তিনিই আমি। ওলামারা তাকে মুরতাদ বলে ঘোষণা দিয়ে তার কতলের রায় দিয়েছিলেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। তারা যে এই ধরণের সাংঘাতিক কথা সমূহ বলে আল্লাহ্‌পাক তা হতে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র।

ইবাদতে শির্‌কের মাধ্যমে ঈমান নষ্ট

দ্বিতীয় ভাগ : এতে আছে আল্লাহ্ পাক যে মা'বুদ তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর ইবাদতে কোন শির্‌ক করা। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো :

১। তারা, যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছগাছালী, শয়তান ও অন্যান্য মখলুকের ইবাদতকারী। আর তারা, যে আল্লাহ্ এই সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা, তাঁর ইবাদত হতে বিরত থাকে। আর এই সমস্ত জিনিস না কারও ভাল করতে পারে আর না পারে ক্ষতি করতে।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . (فصلت: ٣٧)

অর্থাৎ *((আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে আছে রাত্র, দিবস, সূর্য, চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা কর না বরঞ্চ ঐ আল্লাহ্র সিজদা কর যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে তারই ইবাদত করতে চাও))*। সূরা ফুচ্ছেলাত, আয়াত ৩৭।

২। ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তার ইবাদত করার সাথে সাথে অন্য মখলুকেরও ইবাদত করে থাকে। যেমন আউলিয়াদের ইবাদত করে তাদের ছবি বা কবরকে সামনে রেখে। এরা ইসলামের পূর্বের ঐ মুশরেকদের সমতুল্য। কারণ তারাও আল্লাহ্র ইবাত করত এবং যখনই প্রচণ্ড বিপদে পড়ত একমাত্র তাঁকেই ডাকত। আর সুখের সময় অথবা বিপদ কেটে গেলে অন্যদের ডাকত। তাদের সম্বন্ধে কুরআনে বলে ঃ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ . (العنكبوت: ٦٥)

অর্থাৎ *((আর যখন তারা কোন নৌকায় আরোহণ করত তখন ইখলাছের সাথে তাঁকে ডাকত আর যখন তিনি তাদের রক্ষা করে তীরে পৌঁছিয়ে দিতেন তখনই তারা তার সাথে শির্ক করত))*। সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৫।

আর আল্লাহ্পাক এদেরকে শির্ক বলে বর্ণনা করেছেন যদিও তারা যখন নৌকাতে ডুবে যাওয়ার ভয় পেত তখন এক আল্লাহ্কে মনে প্রাণে ডাকত। কিন্তু তারা উহার উপরে সর্বদা চলত না, বরঞ্চ যখন তিনি তাদের উদ্ধার করতেন তখন তারা অন্যকেও তাঁর সাথে ডাকত।

৩। আল্লাহ্পাক ইসলামের পূর্বের আরবদের অবস্থা সম্বন্ধে রাজী খুশী ছিলেন না, আর বিপদের সময়ে তাঁকে যে তারা ডাকত ঐ এখলাছকেও তারা গ্রহণ করতে রাজী ছিলনা। ফলে তাদেরকে তিনি মুশরিক বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাহলে বর্তমান জামানার কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী লোক আজকাল সুখের ও দুঃখের উভয় সময়ই আউলিয়া বলে কথিত লোকদের কবরে যেয়ে আশ্রয় ও বিপদমুক্তি চায় তাদের সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা ? আর তাদের নিকট এমন সব জিনিস চায় যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দেবার ক্ষমতা নেই। যেমন রোগ মুক্তি, রিযিক চাওয়া, হেদায়েত চাওয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য জিনিস। আর তারা এই সমস্ত অলী-আল্লাহ্দের যিনি স্রষ্টা তাকে

ভুলে গেছে। যিনি হচ্ছেন রোগে সুস্থতা দানকারী, যিরিকদাতা, হেদায়েত দানকারী। ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। তারা অন্যদের কান্নাকাটি শুনতেই পায় না। যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌পাক বলেন:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. (فاطر : ١٤٠)

অর্থাৎ *((আর তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের যে ডাকছ তারাতো সামান্যতম জিনিসেরও অধিকারী নয়। যতই তাদের ডাকনা কেনো তারাতো তোমার দু'আ শুনতেই পায় না। আর যদি শুনত, কক্ষণই তোমাদের উত্তর দিত না। আর কিয়ামতের দিন তোমরা যে শির্‌ক করছ তাকে তারা পুরাপুরি অস্বীকার করে বসবে। আর আমার মত এইরকম খবরদাতা ছাড়া অন্য কেহ তোমাকে এইরকম সাবধানও করবে না))*। সূরা ফাতির, আয়াত ১৪০।

২। এই আয়াতে আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের যে ডাকা হয় তা তারা শুনতেও পায়না। আর এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাদের নিকট দু'আ করা বড় শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত।

হয়ত কেহ কেহ বলবে: আমরা তো এই ধরণা পোষণ করি না যে, এই সমস্ত আউলিয়া ও নেককারগণ কোন ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। বরঞ্চ তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বা শাফায়াতকারী হিসাবে গ্রহণ করছি যাদের অছিলায় আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করি। তাদের উত্তরে আমরা বলব: ইসলামের পূর্বের মুশরিকরাও এই ধারনাই পোষণ করতো। তাদের সম্বন্ধে কুরআন বলছে:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. (يونس ، ١٨)

অর্থাৎ *((আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের যে ইবাদত করত তারা তাদের না কোন ক্ষতি করতে পারত, আর না ভাল করতে পারত। তারা বলত, এরা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াতকারী। হে নবী আপনি বলুন: তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কোন কথা বলতে চাও যা আসমান ও জমিনের কেহ জানে না? সমস্ত পবিত্রতাতো আল্লাহ্‌র। আর এরা যে শির্‌ক করেছে তিনি তার অনেক উর্দ্ধে))*। সূরা ইউনুছ, আয়াত ১৮।

এই আয়াত হতে এটা স্পষ্টই প্রতিয়মান হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে ও দু'আ করে তারা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত। যদিও তাদের অন্তরে এটা থাকে যে, তারা ভাল বা মন্দ কিছুই করতে পারে না, বরঞ্চ তারা শুধুমাত্র শাফায়াত করার অধিকারী।

আল্লাহ্পাক মুশরিকদের সম্বন্ধে বলেন ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. (الزمر : ٣)

অর্থাৎ *((আর যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের আউলিয়া হিসাবে গ্রহণ করে, তারা বলে যে, আমরাতো তাদের ইবাদত করি এজন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করায়ে দিবে। আল্লাহ্পাক, তারা যে সমস্ত ব্যাপারে মতবিরোধ করছে তার বিচার অবশ্যই করবেন। আল্লাহ্পাক কখনই কোন মিথ্যাবাদী কাফিরদের হেদায়েত দান করবেন না))*। সূরা যুমার, আয়াত ৩।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে এটাই বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ করবে তারা কাফির। কারণ, রাসূল ﷺ বলেনঃ (নিশ্চয়ই দু'আ হচ্ছে ইবাদত) তিরমিযি, হাসান ছহীহ,

৪। ঈমান ভঙ্গকারী আমলের মধ্যে আছে, যদি এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, আল্লাহ্পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা বিচার করা বর্তমান যামানায় সম্ভব নয়। অথবা অন্যান্য যে মানুষের বানানো নিয়ম কানুন আছে তাকে যদি ছহীহ্ মনে করা হয় তাহলেও সে কাফির। কারণ এই হুকুম দেওয়াটাও হচ্ছে ইবাদত। কারণ আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (يوسف : ٤٠)

অর্থাৎ *((হুকুম দেওয়ার মালিক ত একমাত্র আল্লাহ্। তিনি হুকুম করেছেন তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করবে না। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরাই এটা জানে না))*। সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. (المائدة : ٤٤)

অর্থাৎ *((আর যারা আল্লাহ্পাক কর্তৃক নাজিলকৃত আয়াত দ্বারা বিচার করবে না তারাই হচ্ছে কাফির))*। সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৪।

আর যদি কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নাজিলকৃত কানুন ছাড়া অন্য আইন দ্বারা বিচার করে এই ধারণা করে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনই সঠিক, কিন্তু মানুষের আইনে বিচার করে নিজের নফ্সানিয়াত অনুযায়ী অথবা দায়ে ঠেকে তবে সে জালিম ও ফাসেক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কওল অনুযায়ী সে কাফির নয়। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কোন হুকুমকে অস্বীকার করে সে কাফের। আর যে উহাকে স্বীকার করে অথচ সেই অনুযায়ী বিচার করেনা সে জালিম ও ফাসেক))। ইহাকে ইবনে জরীর তবারী (রঃ) গ্রহণ করেছেন। আর আতা'আ (রঃ) বলেনঃ (কুফর এর ছোট কুফ্রিও আছে)। কিন্তু যদি কেহ আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করে ঐ স্থানে মানুষের বানানো কোন আইন কানুনের প্রচলন করে এই বিশ্বাসে যে, উহা এই যামানার জন্য উৎকৃষ্ট তবে সে কাফির হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এতে কোন দ্বিমত নেই।

৫। ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছেঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচারে খুশী না থাকা। অথবা এতটুকুও ধারনা করা যে, ঐ বিচার বড়ই সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ـ (النساء: ٦٥)

অর্থাৎ *((না, কক্ষনই নয়, তোমার রবের কসম! তারা কক্ষণই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয় তাতে তোমাকে বিচারক না করে। তারপর তুমি যে বিচার করবে তাতে তাদের অন্তরে কোন কষ্ট অনুভব করবে না বরঞ্চ তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিবে))*। সূরা নিসা, আয়াত ৬৫। অথবা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিচারকে অপছন্দ করা। কারণ আল্লাহ্পাক বলেনঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ـ (محمد: ٨ ـ ٩)

অর্থাৎ *((আর যারা কুফরি করে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তাদের আমলসমূহ গোমরাহীতে পরিণত হবে। কারণ, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ (হুকুম) সমূহকে অপছন্দ করেছিল। ফলে তাদের আমলসমূহকে তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন))*। সূরা *মুহাম্মদ, আয়াত ৮, ৯।*

ঈমান নষ্টকারী 'আমলের মধ্যে আল্লাহ্‌র ছিফত সমূহে শির্‌ক করা

তৃতীয় ভাগ ঃ এতে আছে আল্লাহ্‌পাকের ছিফত সমূহকে বা সুন্দর নামসমূহ অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করা।

১। ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছে, কোন মোমেন কর্তৃক আল্লাহ্‌পাকের সুন্দর নাম বা ছিফত সমূহকে অস্বীকার করা যা কুরআন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা ছাবেত আছে। যেমন– আল্লাহ্‌পাক যে সর্বজ্ঞাত তা অস্বীকার করা, অথবা তাঁর কুদ্‌রতকে বা তাঁর জীবনকে বা শোনা বা দেখাকে, অথবা তাঁর কথাকে বা তাঁর রহমতকে অথবা তিনি যে আরশের উপর আছেন তাকে অথবা তিনি যে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন তাকে অথবা তাঁর হস্তকে অথবা চক্ষুদ্বয়কে অথবা পদদ্বয়কে অথবা অন্যান্য যে ছিফত সমূহ ছাবেত আছে যারা তার শান অনুযায়ী আর উহারা কোন মখলুকের সাথে কোন মিল রাখে না এসব বিষয়কে অস্বীকার করা। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. (الشورى ١١)

অর্থাৎ *((তাঁর মত কেহ নয়, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন))*। সূরা শোরা, আয়াত ১১। আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট ভাবে এই আয়াতে বলেছেন যে, তার সাথে কোন সৃষ্টির কোন মিল নেই। কিন্তু তার যে শোনার ও দেখার ক্ষমতা আছে তা তিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য ছিফতও একই রকম।

২। বিশেষ করে কিছু কিছু ছিফতকে ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলাও বিশেষ ভুল ও গোমরাহীর অন্তর্ভুক্ত। উহাদের প্রকাশ্য অর্থ হতে অন্য অর্থে নিয়ে যাওয়াও এর মধ্যে শামিল। যেমন, এস্‌তোয়াকে এস্‌তাওলা বলা। এস্‌তোয়ার অর্থ হল উর্দ্ধারহণ এবং উচু হওয়া যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ কিতাবে বলেছেন ইমাম মুজাহিদ ও আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করে। তারা উভয়েই ছিলেন ছলফে ছালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা ছিলেন তাবেয়ীন। যখনই কোন ছিফতকে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা তাকে অস্বীকারের পর্যায়ে পড়ে। কারণ এস্‌তোয়াকে যখন এসতাওলা বলা হয় তখন আল্লাহপাকের এক ছিফতকে অস্বীকার করা হয়। উহা হল, আল্লাহ যে আরশের উপর আছেন সেই ছিফতকে অস্বীকার করা, যার কথা কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى. (طه : ٥)

অর্থাৎ *(আল্লাহ্‌পাক) রহমান আরশে অবস্থান নিলেন। (উঠলেন ও উর্দ্ধারোহণ করলেন)*। সূরা তহা, আয়াত ৫।

অন্যত্র আল্লাহ্পাক বলেনঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ . (الملك، ١٦)

অর্থাৎ *((তোমরা কি ঐ জাত হতে নির্ভয় হয়ে গেলে যিনি আসমানের উপর আছেন আর যিনি তোমাদের পৃথিবীতে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন))*। সূরা মূল্‌ক, আয়াত ১৬।

আর রাসূল ﷺ বলেছেনঃ *(আল্লাহ্পাক এক কিতাব লিখেছেন . . . উহা তাঁর নিকট আছে আরশের উপর)*। বুখারী ও মুসলিম।

যখনই কোন ছিফতের ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, উহা সাথে সাথে বিকৃত ব্যাখ্যায় পরিণত হয়।

শাইখ মুহাম্মদ আমিন আশ্মান্‌কিতি ("আদ্ওয়াউল বয়ান" নামক তফসীরের লেখক) তার "মানহাজ ওয়া দেরাসাত ফিলআসমা ওয়াচ্ছিফাত" নামক গ্রন্থে ২৩ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ আমি এই প্রবন্ধকে শেষ করতে চাচ্ছি ২টি বিষয়ে আলোচনা করেঃ প্রথমতঃ যারা এভাবে ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে তাদের খেয়াল করা উচিত আল্লাহ্পাকের ঐ কথার প্রতি যাতে তিনি ইহুদীদের বলেছিলেনঃ

وَقُولُوا حِطَّةٌ . (البقرة، ٥٨)

((এবং তোমরা বল হিত্তাহ))। সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫৮।

তারা এই শব্দের সাথে "নু" বাড়িয়ে বলেছিল "হিন্‌তা" আর ইহাকে আল্লাহ্পাক বলেছেন তারা কথা বদল করেছিল। এই সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ . (البقرة : ٥٩)

অর্থাৎ *((আর যারা জালিম ছিল তারা ঐ কথা, যা তাদের বলতে বলা হয়েছিল, তা বদলিয়ে বলল। ফলে আমি ঐ জালিমদের উপর তাদের ফাসিকী কার্যের জন্য আসমান হতে আযাব বর্ষণ করি))*। সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫৯।

সেইরকম আল্লাহ্ বলেন 'এস্তোয়া' বলতে আর তারা বলছে "এসতাওলা"। খেয়াল করে দেখুন এরা এখানে "লামকে" বাড়িয়েছে যেমন করে ইহুদীরা "নুনকে" বাড়িয়েছিল। [ইহা ইবনে কাইউম (রহঃ)ও উল্লেখ করেছেন]।

৩। আল্লাহ্পাক তার নিজের জন্য খাস করে এমন কিছু ছিফত রেখেছেন যা তাঁর মখলুকের কারো মধ্যেই নেই। যেমন গায়েবের এলেম।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .(الانعام : ٥٩)

অর্থাৎ *((আর তাঁর নিকট আছে সমস্ত গায়েবের চাবি কাঠি যা অন্য কেহ জানে না))*। সূরা আনআম, আয়াত ৫৯।

আর আল্লাহ্পাক তাঁর রাসূলদের মাঝে মাঝে কিছু গায়েবের কথা জানিয়েছেন অহীর মাধ্যমে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ...
(الجن : ٢٦)

অর্থাৎ *((তিনি হচ্ছেন গায়েব জাননেওয়ালা। অন্য কারও কাছে উহা তিনি প্রকাশ করেননি। তবে রাসূলদের মধ্যে কাউকে কাউকে খুশী হয়ে (জানিয়েছেন))*। সূরা জিন, আয়াত ২৬।

"বুরদাহ" নামক কবিতায় বুছাইরি রাসূল ﷺ সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে কুফরি ও গোমরাহী প্রকাশ পায়।

তিনি বলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আপনার দয়াতেই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং চলমান। আর আপনার এলেম হতেই লওহে মাহ্ফুজ ও কলমের এলেম।

কিন্তু, সত্যিকার ভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহপাক কর্তৃক ও তারই দয়ায়। উহা রাসূল ﷺ এর দয়ায় বা তাঁর সৃষ্টির কারণে হয়নি, যেমন ভাবে উক্ত কবি বলেছেন।

আল্লাহ্পাক বলেন ঃ

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ .(الليل : ١٣)

অর্থাৎ *((নিশ্চয়ই আমার জন্যই আখিরাত ও দুনিয়া))*। সূরা লাইল, আয়াত ১৩।

নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ লওহে মাহ্ফুজে কি আছে তা জানেন না, আর কলম দ্বারা কি লেখা হয়েছে তাও তিনি জানেন না, যা কিনা উপরোক্ত কবি বলেছেন।

কারণ, এগুলি হচ্ছে এমন গায়েব যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানে না। এই সম্বন্ধে কুরআন বলে ঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ .(النمل : ٦٥)

অর্থাৎ *((হে নবী ! আপনি বলুন, আসমান ও জমিনের গায়েব কেহ জানে না আল্লাহ্ ব্যতীত))*। সূরা নমল, আয়াত ৬৫।

আর অলী-আল্লাহ্দের তো প্রশ্নই উঠে না যে, তারা গায়েব জানবে। আর অহীর মাধ্যমে আল্লাহপাক রাসূলদের যে গায়েবের খবর দিতেন তাও তারা জানতে পারে না। কারণ, অহী কখনও আউলিয়াদের উপর অবতীর্ণ হয় না। উহা খাছভাবে নবী ও রাসূলদের উপর অবতীর্ণ হত। তাই, যে ব্যক্তিই দাবী করবে যে, সে এলমে গায়েব জানে আর যারা তাদের বিশ্বাস করবে, উভয় দলেরই ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্বন্ধে রাসূল বলেন: *(যে ব্যক্তি কোন গায়েব জানার দাবীদার ব্যক্তি বা গণক (যারা হাত দেখে) এর নিকট যাবে এবং তারা যা বলে তা বিশ্বাস করবে তবে সে যেন মুহাম্মদ এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করে কুফরি করল)*। আহমদ, সহীহ।

এই জাতীয় এলমে গায়েব জানার দাবীদার ও চরম মিথ্যাবাদী দজ্জালরা যা বলে উহা হচ্ছে তাদের ধারনা, কোন শয়তানের ধোকাবাজী। যদি তারা সত্যই সত্যবাদী হত তবে ইহুদীদের গোপন কথাগুলো আমাদের জানিয়ে দিত। আর জমিনের গুপ্তধন সমূহ বের করে দিত। আর এভাবেই তারা মানুষদের উপর বোঝা হয়ে পড়েছে। আর তাদের পয়সা বাতেল ভাবে গ্রহণ করছে।

রাসূল এর ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা ঈমান নষ্ট করে

চতুর্থ ভাগ: ঈমান নষ্টকারী আমল সমূহের মধ্যে আছে কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা বা তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারনা পোষণ করা। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে:

১। আমাদের রাসূল এর রেসালাতকে অস্বীকার করা। কারণ, মুহাম্মদ যে আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের রোকনের এক রোকন।

২। রাসূল সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারনা পোষণ করা বা সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বা আমানত বা পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা। রাসূল কে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অথবা তাঁর অবমূল্যায়ন করা অথবা তার কার্য সমূহ যা ছাবেত আছে সে সম্বন্ধে কোন আজে বাজে কথা বলা।

৩। রাসূল এর কোন সহীহ হাদীছ সম্বন্ধে খারাপ কথা বলা বা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা অথবা তিনি যদি কোন সত্য খবর দিয়ে থাকেন তাকে অস্বীকার করা। যেমন: দজ্জালের প্রকাশ পাওয়া অথবা ঈসা (আঃ)কে আসমান হতে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর শরীয়ত মত বিচার করবেন একথা অস্বীকার করা। এই জাতীয় আরও অনেক কথা যা কুরআন দ্বারা বা সহীহ হাদীছ দ্বারা ছাবেত আছে তা অস্বীকার করা।

৪। অথবা কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করা যাদের আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেছিলেন আমাদের রাসূল ﷺ এর পূর্বে অথবা তাদের সময়ে যে ঘটনা ঘটেছিল তাদের কওমদের সাথে যা আল্লাহ্পাক কুরআনে বর্ণনা করেছেন বা রাসূল ﷺ সহীহ্ হাদীছে বর্ণনা করেছেন তা অস্বীকার করা।

৫। যারা রাসূল ﷺ এর পরে মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে। যেমন– মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী করেছে। কুরআন তার দাবীর বিরোধিতা করে বলছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. (الأحزاب ٤٠)

অর্থাৎ *((মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্যের কোন পুরুষের পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীদের শেষ নবী))*। সূরা আহ্যাব, আয়াত ৪০।

আর রাসূল ﷺ বলেনঃ

وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. (متفق عليه)

অর্থাৎ *(আমিই শেষ, আমার পর আর কোন নবী নেই)*। বুখারী ও মুসলিম।

যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অন্য কোন নবী আছে, সে কাদিয়ানীই হউক বা অন্য কেহ, তবে সে কুফরি করল আর তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেল।

৬। যারা রাসূল ﷺ কে এমন সব গুণে বিভূষিত করে যা আল্লাহপাকও করেননি। যেমনঃ সর্ব ধরনের এলমে গায়েব তিনি জানতেন। যেমনঃ অনেক সুফী পীরেরা বলে থাকে। তাদের এক কবি বলেঃ

হে সমস্ত এলমে গায়েব জাননেওয়ালা! আমরাতো বিপদে পড়লে তোমার দিকেই ধাবিত হই। হে অন্তরের শুদ্ধিকারী! আপনার উপর দরূদ বর্ষিত হউক।

৭। যারা রাসূল ﷺ হতে এমন জিনিস পেতে ইচ্ছা করে যা দেবার মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহ নয়। যেমনঃ সাহায্য চাওয়া, বিজয়ের সাহায্য চাওয়া, রোগমুক্তি অথবা এই জাতীয় কার্যসমূহ, যা আজ মুসলিমদের মধ্যে বহু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে সুফীদের মধ্যে। তাদের কবি বুছাইরী বলেনঃ এমনকি গভীর জঙ্গলে কোন সিংহ যদি কারও সম্মুখে এসে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং এমন মুহূর্তে যদি রাসূল ﷺ এর নিকট সাহায্য চাওয়া হয় তবে তিনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যতবারই সময়ের চক্র আমাকে কষ্টে ফেলেছে আর আমি তার নিকট আশ্রয় চেয়েছি ততবারই উহা তাঁর নিকট হতে পেয়েছি।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় কথাগুলো শির্‌ক দ্বারা পূর্ণ। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ . (الانفال : ١٠)

অর্থাৎ *((সাহায্য কখনই আসতে পারে না আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহ হতে))*। সূরা আন্‌ফাল, আয়াত ১০।

আর রাসূল ﷺ নিজেও উপরোক্ত ধরনের কবিতার বিরোধিতা করে বলেন ঃ "যদি কিছু চাও আল্লাহর নিকট চাও। আর যদি সাহায্য চাও তবে তাঁর নিকটেই চাও)) তিরমিযি, হাসান সহীহ।

তাহলে কিভাবে এটা সম্ভব যে, লোকেরা বলে যে, আউলীয়াগণ গায়েবের এলেম জানেন অথবা তাদের জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর নজর নেয়াজ মানত দেয়। আর তাদের জন্য কুরবানী যবহ করে। আর তাদের কাছে এমন সব জিনিসের দাবী করে যা আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট পাওয়ার আশা নাই। যেমন ঃ রিযিক চাওয়া, রোগ মুক্তি চাওয়া ও বিপদে উদ্ধার চাওয়া ও এই জাতীয় অন্যান্য মদদ! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই আমলগুলো বড় শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত।

৮। তবে আমরা রাসূল (আঃ) গণের কোন মোজেযাকে অস্বীকার করি না। আর না আউলিয়াগণের কারামত সমূহ। তবে যেটা আমরা অস্বীকার করি তা হল তাদেরকে আল্লাহর শরীক বানান।

আল্লাহর নিকট যেভাবে দু'আ করি তাদের নিকটও না একই ভাবে দু'আ করি কিংবা তাদের জন্য না যবেহ্‌ করি অথবা না তাদের জন্য নজর নেয়াজ মানত পেশ করি। এমনকি তাদের কারো কারো মাজার (যাদের তারা আউলিয়া বলে) টাকা পয়সা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আর উহা ঐ মাজারের খাদেম ও পুজারীরা গ্রহণ করে বাতেল ভাবে আহার করে। আর অন্যদিকে কত ফকির মিসকিন রয়েছে যাদের মুষ্ঠি আহারও জোটে না।

এমনি এক কবি বলেন ঃ

আমাদের কত জীবিত ব্যক্তি আছেন যারা এক পয়সাও পায় না। আর অনেক মৃতরা লাখ লাখ টাকা কামাই করে। অন্যদিকে অনেক ধরনের মাজার, (কবর), জিয়ারতের পবিত্র জায়গার মূল বলে কিছুই নেই। বরঞ্চ ওগুলো মিথ্যাবাদীদের বানান। এই সমস্ত ধোকাবাজরা ঐগুলো স্থাপন করেছে যাতে করে মানতের নামে তাদের নিকট টাকা পয়সা আসে। এর দলীল নিম্নে পেশ করছি ঃ

প্রথম ঘটনা

আমার এক বন্ধু, যার সাথে আমি একত্রে পড়াশুনা করেছি তিনি বলেনঃ সুফীদের এক পীর একদা আমার মা'র বাড়ীতে আসেন এবং তার নিকটে চাঁদা চায় একটা নির্দিষ্ট রাস্তায় এক অলীর কবরে সবুজ পতাকা স্থাপন করার জন্য। তখন তিনি তাকে কিছু টাকা দেন। সে ইহা দ্বারা একটা সবুজ কাপড় খরিদ করে এবং উহা কবরের উপর স্থাপন করে। তারপর লোকদের ডেকে ডেকে বলতে থাকে ঃ ইনি আল্লাহর অলীদের একজন। আমি স্বপ্নে তার দেখা পাই। এইভাবে সে টাকা পয়সা জমাতে শুরু করে। তারপর যখন সরকারের তরফ হতে রাস্তা প্রশস্ত করতে চায় এবং কবরকে উচ্ছেদ করতে চয় তখন ঐ ব্যক্তি, যে মিথ্যা মিথ্যা এই কবরকে স্থাপন করেছিল, এই বলে চতুর্দিকে গুজব ছড়াতে লাগল যে, যে যন্ত্র দ্বারা এই মাজার উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল উহা ভেঙ্গে গিয়েছে। কিছু কিছু লোক উহা বিশ্বাসও করে। চতুর্দিকে উহা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সরকার এ ব্যাপারে ভয় পেতে শুরু করে। এই দেশের মুফতি আমাকে বলেন যে, হুকুমত এর লোকেরা এক মধ্যরাত্রিতে তার নিকটে এসে বলে, ওমুক অলীর কবরকে অপসারণ করতে হবে। তিনি সেখানে যেয়ে দেখেন সৈন্যরা ঐ জায়গা ঘিরে রেখেছে। তারপর যন্ত্রপাতি এনে কবরকে উচ্ছেদ করা হয়। এই মুফতী কবর স্থানে প্রবেশ করলেন ভিতরে কি আছে তা দেখার জন্য, কিন্তু তিনি ভিতরে কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন বুঝতে পারলেন এই কবর মিথ্যা ও বানান।

দ্বিতীয় ঘটনা

আমরা মক্কার হারাম শরীফের এক শিক্ষকের নিকট এই ঘটনা শুনেছিলাম। একদা এক ফকির ব্যক্তি তার মত আব এক ফকিরের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রত্যেকেই তাদের দারিদ্র্যতার ব্যাপারে বহু কথা বলে। তারপর তারা এক অলীর কবরের প্রতি খেয়াল করে দেখে যে, উহা টাকা পয়সা, সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ। তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলে যে, এসো, আমরা একটা কবর বানিয়ে তা এক অলীর নামে প্রচার করি, ফলে আমরা অনেক টাকার মালিক হয়ে যাব। তার বন্ধু তাতে সম্মত হয় এবং তারা একত্রে রাস্তা দিয়া হাটতে শুরু করে। রাস্তায় দেখে, এক গাধা চিৎকার করছে। তখন তারা তাকে যবেহ করে এবং এক গর্তে তাকে পুঁতে রাখে। আর তার উপরে এক কবর ও গম্বুজ তৈরী করে। তখন তাদের প্রত্যেকে ঐ কবরে মাথা ঘষতে থাকে, সিজদা করতে থাকে বরকতের জন্য। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। তারা বলে, ইহা হচ্ছে অলী হুবাইশ ইবনে তুবাইশের কবয়। তার যে কত কেরামত ছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলে, কবরের নিকটে লোকেরা নজর

মানত হিসাবে টাকা পয়সা, ছদকাহ্ ও অন্যান্য দান খয়রাত করতে শুরু করে। এভাবে আস্তে আস্তে প্রচুর টাকা জমা হয়। একদিন এই ফকিরদ্বয় বসে বসে তাদের টাকা পয়সা ভাগ করতে শুরু করে। ভাগ করতে যেয়ে তাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়।

তাদের চেচামেচি শুনে লোকেরা জড় হতে শুরু করল। তখন তাদের একজন বলল: এই অলীর কসম আমি তোমার নিকট হতে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তখন অন্যজন বলল: তুমি এই অলীর কসম খাচ্ছ! তুমি ও আমি এটা ভাল করেই জানি যে, এই কবরে এক গাধা আছে যাকে আমরাই দাফন করেছিলাম। লোকেরা তার কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। আর তারা যে নজর নেয়াজ দিয়েছিল তার জন্য আফসোস করতে শুরু করল। তখন তাদের ধমকিয়ে ও তিরস্কার করে লোকেরা তাদের মালামাল ফেরত নিয়ে গেল !!

বাতিল আকিদা যা কুফরির দরজাতে পৌঁছায়

১। যেমন অনেকে বলেন যে, আল্লাহপাক রাসূল ﷺ এর কারণে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তারা দলীল হিসাবে নিম্নের মিথ্যা হাদীছে কুদসী পেশ করে। উহা হল: (যদি না তুমি হতে তবে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না)। ইবনে জওযী (রহঃ) বলেন: ইহা মউজু হাদীছ। আর বুছাইরী যখন নিম্নের কবিতা বলে তখন মিথ্যা বলে: কিভাবে দুনিয়ার জরুররতের দিকে ডাকবে? যদি তিনি (মুহাম্মদ ﷺ) না হতেন তবে দুনিয়াকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা হত না।

উপরোক্ত আকিদা আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার খেলাপ। আল্লাহ্পাক বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ. (الذاريات ٥٦)

অর্থাৎ *((নিশ্চয়ই আমি জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য))*। সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ কে পর্যন্ত তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেন। কারণ তাঁর রব তাঁকে বলেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (الحجر ٩٩)

অর্থাৎ *((আপনি আপনার রবের ইবাদত করতে থাকুন যতক্ষণ না আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়))*। সূরা হাজর, আয়াত ৯৯।

আর আল্লাহ্পাক সমস্ত রাসূল (আঃ) দের সৃষ্টি করেছিলেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. (النحل: ٣٦)

অর্থাৎ *((আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতদের নিকট এই বলে রসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতদের থেকে দূরে থাক))।* সূরা নহ্ল, আয়াত ৩৬।

"তাগুত" হচ্ছে তারা যাদের ইবাদত করা হয় আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে, আর তারা তাতে রাজী খুশী থাকে।

তাই এখন চিন্তা করে বলুন, কিভাবে কোন মুসলিম ঐ আকীদা পোষণ করবে যা কুরআনের বিরোধী ও সমস্ত রাসূলদের সর্দারের কথারও বিরোধী ??

২। এই কথা বলা যে, আল্লাহ্পাক সর্ব প্রথম রাসূল ﷺ এর নূরকে সৃষ্টি করেন। আর তাঁর নূর হতেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা হয়। এই আকিদা বাতেল আকিদা। এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। সত্যিই অবাক লাগে, এই কথা যখন মিশরের এক প্রসিদ্ধ আলেম বলেন। তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মদ মোতাওয়াল্লী আশ্‌শা'রাভী। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আন্‌তা তাস্ আলু ওয়াল ইসলামু ইয়াজীব"। এতে তিনি নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ এর নূর এবং সৃষ্টির শুরু।

প্রশ্ন ঃ হাদীছ শরীফে আছেঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করেন ঃ আল্লাহপাক সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেন ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ হে জাবের, তোমার নবীর নূর। এই হাদীছ কিভাবে কুর'আনের ঐ আয়াতের বিরোধী হতে পারে যাতে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল আদম (আঃ) এবং তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে ?

উত্তর ঃ কোন জিনিসের পূর্ণতা এবং স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে সর্বদাই কোন উচ্চমানের জিনিস প্রথম সৃষ্টি করা। তারপর উহা হতে নিম্নদিকে যাত্রা করা। তাই এটা বুদ্ধির অধগম্য বিষয় হল এই যে, মাটির তৈরী জিনিস আগে সৃষ্টি করা হবে এবং তারপর উহা হতে মুহাম্মদ ﷺ কে সৃষ্টি করা হবে। কারণ মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন রাসূল (আঃ) গণ। আর সমস্ত রাসূল (আঃ)দের মধ্যে উত্তম হলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ। তাই প্রথমে মাটি দ্বারা কোন সৃষ্টি হয়ে পরে মুহাম্মদ ﷺ সৃষ্টি হতে পারেন না। তাই অবশ্যই মুহাম্মদ ﷺ এর নূরকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ﷺ এর নূর হতেই সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এভাবেই জাবের (রাঃ) এর হাদীছ সত্য বলে প্রমাণিত হল।

এই ভাবেই তিনি তার অপরিপক্ক বুদ্ধি দ্বারা উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দেন যে, নূরই প্রথম, তারপরই অন্য বস্তু।

প্রথমতঃ শা'রাভীর কথা আল্লাহপাকের কথার বিরোধী, যাতে তিনি বলেছেন, প্রথম মানুষ হলেন মুহাম্মদ ﷺ।

আল্লাহপাক বলেন :

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. (ص ، ٧١)

অর্থাৎ *((আর যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদের (মালাইকাদের) বললেন: নিশ্চয়ই আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব))*। সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৭১।

অন্যত্র তিনি বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ. (غافر ٦٧)

অর্থাৎ *((তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন প্রথমে মাটি হতে তারপর বীর্য হতে))*। সূরা গাফের, আয়াত ৬৭। এর তফসীরে ইবনে জরীর (রঃ) বলেন : আল্লাহপাক তোমাদের পিতা আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তোমাদের সৃষ্টি করেন বীর্য হতে। মুখতাছার ইবনে জরীর, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩০০।

আর শা'রাভীর কথাও ঐ হাদীছের বিপরীত যাতে বলা হয়েছে: তোমরা প্রত্যেকে আদমের সন্তান। আর আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাজ্জার, সহীহ।

শা'রাভী বলেছেন : প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে উচ্চ স্তরের কোন কিছু সৃষ্টি করে তা হতে নীচু স্তরের জিনিস সৃষ্টি করা। এমনকি কুরআন পাকেও এই জাতীয় মতবাদ পেশ করেছে ইবলিস, যখন সে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করল।

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. (ص، ٧٦)

অর্থাৎ *((আমি তাঁর থেকে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে আর তাঁকে মাটি হতে))*। সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৭৬।

ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন : সে এই দাবী করেছিল যে, সে আদম (আঃ) হতে উত্তম। কারণ তাকে সৃষ্টি করা হয় আগুন হতে আর আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয় মাটি হতে। আর তার ধারনা মতে আগুন মাটি হতে উত্তম। তাফসীর ইবনে কাসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

ইবনে জরীর তবারী (রহঃ) বলেন ঃ ইবলিস তার রবকে বলে ((আমি কক্ষণই আদমকে সিজদা করব না, কারণ আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন। আর আদম (আঃ) কে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। আর আগুন মাটিকে পোড়ায় এবং তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে) মুখ্‌তাছার ইবনে জরীর, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ২৭০। এর থেকে প্রমাণিত হল সর্বপ্রথমে আদম (আঃ)কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয় এবং তার থেকে পরে মুহাম্মদ ﷺ কে সৃষ্টি করা হয়। পদার্থ প্রথমে সৃষ্টি করা হয়, আর তা হল মাটি, যা হতে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর মুহাম্মদ ﷺ আদম (আঃ) এর বংশ এবং পুত্র। এ সম্বন্ধে রাসূল বলেন ঃ *((আমি আদমের সন্তানদের সর্দার।))* মুসলিম।

তৃতীয়তঃ শা'রাভী আরও বলেছে ঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ এর নূরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর কথার পক্ষে কোন দলীল নেই, বরঞ্চ কুরআনে ছাবেত আছে, প্রথম মানুষ হলেন আদম (আঃ)। সৃষ্টির মধ্যে আরশ ও কলম সৃষ্টির পর তাঁকে [আদম (আঃ)কে] সৃষ্টি করা হয়।

কারণ রাসূল ﷺ বলেন ঃ *(সর্ব প্রথমে আল্লাহ্‌পাক কলম সৃষ্টিকরেন)*। তিরমিযি, সহীহ।

কোন দলীল বা বুদ্ধি দ্বারাও ছাবেত হয়না যে, নূর মুহাম্মদীকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ, কুরআন পাকে আল্লাহ্‌পাক রাসূল ﷺ কে বলতে বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الكهف : ١١٠)

অর্থাৎ *(হে নবী ! আপনি বলুন ঃ আমিত তোমাদের মত মানুষ, আর আমার উপর অহী প্রেরণ করা হয় ...)*। সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০।

আর রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (رواه احمد)

(আমি তোমাদের মতই মানুষ)। আহমদ, সহীহ।

সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ ﷺ বাপ ও মা হতে পয়দা হয়ে ছিলেন। তাঁর আব্বা ছিলেন আবদুল্লাহ আর মা আমিনা বিনতে ওহাব। অন্যরা যেমনি ভাবে পয়দা হয় তিনিও একইভাবে পয়দা হন। তার দাদার নাম রবা (এটা কুনিয়া, প্রকৃত নাম আবদুল মুত্তালিব) এবং চাচার নাম আবু তালিব।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদিছ হতে এটা ছাবেত হল যে, মানুষদের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হলেন আদম (আঃ), আর পদার্থের মধ্যে কলম। এগুলোই ঐ কথার বিরোধিতা করে যে, আল্লাহ্‌পাকের প্রথম সৃষ্টি হল মুহাম্মদ ﷺ। কারণ, উহা কুরআন ও সহীহ হাদীছের বিরোধীতা করে। তবে হাদীছে যা আছে তা হল: আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্‌পাকের নিকট লেখা ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ হলেন শেষ নবী। কারণ রাসূল ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট শেষ নবী বলে লিখিত ছিলাম তখন, যখন আদম (আঃ) মাটিতেই ছিলেন (তাঁর সৃষ্টির পূর্বে)। সহীহ হাকেম।

এই হাদীছে আছে: লিখিত ছিলাম। এতে বলা হয়নি যে, সৃষ্টি করা হয়েছিল।

অন্য হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন: আমি তখনও নবী বলে পরিগণিত হই যখন আদম (আঃ) রুহ ও শরীর উভয়ের মাঝে ছিলেন)) (অর্থাৎ সৃষ্টি হন নাই) আহমদ, সহীহ।

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে "সৃষ্টির দিক দিয়ে আমি প্রথম নবী, আর প্রেরণের দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী" উহা দুর্বল– বলেছেন ইবনে কাসির, মান্নাভী ও আলবানী।

উহা কুরআনপাক ও পূর্বোক্ত সহীহ হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ কথা। সাথে সাথে উহা বুদ্ধি ও বিবেকেরও উল্টো। কারণ আদম (আঃ) এর পূর্বে কোন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি।

চতুর্থতঃ শা'রাভী বলেন: মুহাম্মদ ﷺ এর নূর হতেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে। তার কথায় বুঝা যায়, আদম (আঃ), শয়তান, মানুষ, জিন, পশুপক্ষী, পোকা মাকড়, জীবাণু ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসই উহা হতে সৃষ্টি। কিন্তু উহা কুরআনে যে কথা বলা আছে তার বিপরীত কথা। কারণ আদম (আঃ) কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানকে আগুন হতে, আর মানুষদেরকে বীর্য হতে। শা'রাভীর কথা রাসূল ﷺ এর ঐ কথার বিরোধী যাতে তিনি বলেন:

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. (رواه مسلم)

(ফেরেশতাদের (মালাইকাদের) সৃষ্টি করা হয়েছে নূর হতে, আর জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা হতে, আর আদম (আঃ) কে ঐ জিনিস হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের বলা হয়েছে)। মুসলিম।

এতে দেখা যাচ্ছে, শারাভীর কথা বুদ্ধি, বিবেক ও বর্তমান পরিস্থিতি সব কিছুরই খেলাফ কথা। কারণ মানুষ, জীবজন্তু সৃষ্টি হয় গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের মাধ্যমে।

যদি ধরা হয় যে, জীবাণু, বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক পোকা মাকড় এবং এই জাতীয় সমস্ত কিছু মুহাম্মদ ﷺ এর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে তবে কেন আমরা ঐ সব ক্ষতিকর জীবাণুকে হত্যা করি। বরঞ্চ আমাদের হুকুম করা হয়েছে সাপ, মশা, মাছি ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবজন্তু হত্যা করতে।

পঞ্চমতঃ শা'রাভী আরও বলেন : জাবের (রাঃ) এর ঐ হাদীছ, যাতে বলা হয়েছে : "(হে জাবের ! সর্ব প্রথম আল্লাহ্পাক তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেন)

এই হাদীছটি নবীর নামে মিথ্যা বানান হয়েছে। শা'রাভীর কথা মত ইহা সত্য নয়। কারণ, উহা কুরআনের বিরোধী কথা যাতে বলা হয়ছে আল্লাহ্পাক সর্বপ্রথম যে মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি হলেন আদম (আঃ), আর জিনিসের মধ্যে কলম। আর মুহাম্মদ ﷺ আদমের সন্তান যাকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়নি বরঞ্চ তিনি আমাদের মত মানুষ যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বিশেষত্ব হল তিনি নবী ছিলেন এবং তার নিকট অহী আসত। লোকেরা তাঁকে নূর হিসেবে দেখেনি বরঞ্চ মানুষ হিসাবে দেখেছে। যে হাদীছকে শা'রাভী সহীহ বলেছে তা হাদীছ বিশারদদের নিকট মিথ্যা, মউজু ও বাতিল হাদীছ।

৩। আরও বাতিল আকিদার মধ্যে আছে, আল্লাহ্পাক সমস্ত জিনিস তাঁর (নবীর) নূর হতে সৃষ্টি করেছেন, যা বহু ছুফীই বলে থাকে। আর শা'রাভী উপরে উল্লেখিত তার কিতাবেও উহা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

তার কথা যদি সত্য হয় তবে বলতে হয়, আল্লাহ্পাক সমস্ত জিনিস তাঁর নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নূরের রশ্মী হতেই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি বলি (লেখক) এই কথার প্রমাণে কুরআন, সুন্নাহ বা বুদ্ধির কোন দলীল নেই। আগেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক আদম (আঃ) কে মাটি হতে, শয়তানকে আগুন হতে এবং মানুষদের বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন। ইহা শা'রাভীর কথার বিরোধিতা করে আর তাকে বাতিলও বলে। আর শা'রাভীর কথাও উল্টোপাল্টা। প্রথমে বলেন : সমস্ত জিনিস মুহাম্মদ ﷺ এর নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে। অন্যত্র বলেন : সমস্ত জিনিস আল্লাহ্পাকের নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই নূরের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্র নূর হতে সৃষ্টি হয়েছে তাতে আছে বাদর, শুকর, সাপ, বিছা, জীবাণু ও অন্যান্য ক্ষতিকারক জীব। তবে কেন আমরা তাদের হত্যা করি ?

দ্বীন হচ্ছে উপদেশ

হে মুসলিম ভাই ! আল্লাহ্পাক আমাদের ও আপনাকে হেদায়েত দান করুন এই জাতীয় কথা হতে যা ছুফী পীরেরা বলে থাকে। আর এগুলো কুরআন ও রাসূলের সুন্নতের বিরোধী। সাথে সাথে উহা বুদ্ধি, বিবেচনারও বিরোধী। আর উহা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَحَبِّبْهُ إِلَيْنَا، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ، وَكَرِّهْهُ إِلَيْنَا، وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ هَدْيِ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হক্কান, ওয়ার যুক্না এত্তেবায়াহু ওয়া হাব্বিবহু ইলাইনা, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়ার যুক্না এজতেনিবাহু। ওয়া কাররিহ্হু ইলাইনা, ওয়ার যুক্না এত্তেবায়া হাদিঈ রাসূলি রব্বিল আ'লামীন।"

অর্থাৎ (হে আল্লাহ্ ! আমাদের হককে হক হিসাবেই বুঝতে দিন আর আমাদের এই তৌফিক দিন যাতে তা অনুসরণ করতে পারি। আর তা আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন। আর বাতিলকে বাতিল বলে বুঝতে দিন এবং আমাদের উহা হতে বিরত থাকতে তৌফিক দান করুন। আর উহাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করুন। আর আমাদেরকে রাসূল ﷺ এর হেদায়েত অনুসরণ করতে দিন যিনি হলেন রব্বুল আ'লামীনের রাসূল। আমীন !

হে আমার মা'বুদ ! আপনিই আমার সাহায্যকারী

হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার সাহায্যকারী কেহ নেই। তাই দয়া করে এই জামানায় আমার সাহায্যকারী বনে যান। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন গুপ্তধন নেই। তাই দয়া করে, আমার হস্তদ্বয় যখন খালি হয়ে যায় তখন আপনি আমার গুপ্তধন হউন। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন রক্ষাকারী নেই। তাই যদি কেহ আমাকে নিক্ষেপ করে তখন আপনি আমার রক্ষাকারী বনে যান। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কোন সম্ভ্রমের বস্তু নেই। তাই যখন কেহ আমাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তখন আপনি আমার সম্ভ্রমের ব্যবস্থা করুন।

হে আমার মা'বুদ ! আপনি ভালমতই অবগত আছেন আমার অন্তরে কি আছে। আর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও কখন, কি করে তা আপনি উত্তমভাবে অবগত আছেন। তাই হে দয়ালু ! মেহেরবানী করে আমার মধ্যে রাজী খুশী ও ধৈর্য্য দান করুন, যদি কদাচিৎ আমার অন্তর বা জিহ্বা দ্বারা কোন ভুল হয়। হে আমার মা'বুদ ! আপনি ছাড়া আমার কেহ সম্মানকারী নাই। তাই দয়া করে আমার সম্মান ও অন্তরের আশা আকাংখার দুর্গ বনে যান।

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا السؤال ،وأجابت عليه بالفتوى رقم (٢٠٠٦٢) .

۞ السؤال / **هل طباعة الكتب الشرعية الصحيحة ينتفع بها الإنسان بعد موته ، ويدخل في العلم الذي يُنتفع به كما جاء في الحديث ؟**

۞ **الجواب** / طباعة الكتب المفيدة التي ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم هي من **الأعمال الصالحة** التي يثاب عليها في حياته ، ويبقى أجرها ، ويجري نفعها له بعد مماته ، ويدخل في عموم قوله ﷺ فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي والإمام أحمد . وكل من ساهم في إخراج هذا العلم النافع يحصل على الثواب العظيم سواء كان مؤلِفاً له أو ناشراً له بين الناس أو مُخرِجاً أو مُساهِماً في طباعته كل بحسب جهده ومشاركته في ذلك .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

আরকানুল ইসলাম

ওয়া

<u>تعريف</u>

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد وآله وصحبه وبعد .

فإن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة بالرياض يقوم بجهودمشكورة فى دعوة الجاليات وتعليمهم الاسلام ويقوم عليه مجموعة من المشايخ الثقات المعروفين لدي وهوفي حاجة ماسة للدعم والمؤازرة .

فأرجومن يطلع عليه احتساب الأجر في دعم المكتب المذكور بمايراه من غير الزكاة .. ولايخفى مافي البذل في هذه الأمور وأشباههامن الأجرالعظيم والثواب الجزيل .. تقبل الله من الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

مفتي عام المملكه العربيه السعوديه

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين قيوم السموات والارضين مدبر الخلائق أجمعين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين

أما بعد فقد تشرفت بزيارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في غرب الديرة [illegible]

١٤٢٠/٢/٢٥ هـ

مطابع الحميضي
هاتف ٤٥٨١٠٠٠